প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩২। জাপানী গল্প।—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য ॥০। মণিবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কতক গুলি জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে এই গল্প সকল রচিত হইল—এগুলি জাপানী গল্পের অনুবাদ নহে। জাপানী গল্পের উপাখ্যান মাত্র অবলম্বন করিয়া আমার নিজের ভাবে সে গুলিকে প্রকাশ করিয়াছি।"

মণিবাবু গল্প সমূহে যে প্রাঞ্জল ভাষা—লিপিকুশলতা, বিচিত্রভাব এবং ঘটনার সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র গ্রন্থখানি শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বালক পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র গল্প রচনায় গ্রন্থকার যে সিদ্ধহস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করিতেছি যে, ভবিষ্যতে এরূপ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য কথা সমূহ যেন পরিত্যাগ করেন। সরল সার্ব্বজনীন বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক গ্রাম্যভাষা গ্রহণের কি প্রয়োজন? "গুক্তোর" স্থলে "মুক্তার", "রূপোর" স্থলে "রূপার", "কুঁড়েয় ফিরছে" স্থলে "কুঁড়েতে ফিরছে", লিখিলে ভাল হয় না কি? "নিদি নিথ্যং" "দিবা গেলে" প্রভৃতি শব্দ পরিত্যাগ করিলে ভাষা কি সৌষ্ঠব-শূন্য হয়?

৩৩। শর-শয্যা। কাব্য। প্রণেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল। মূল্য ৮০। বাঙ্গালা ভাষার পরম সৌভাগ্য যে, দিন দিনই কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইহার অনুশীলনে যত্নবান হইতেছেন। এই পুস্তকের গ্রন্থকার একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ৪ খানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ বিস্তৃত কাব্যে লেখনী চালনা করিবেন, কেহই আশা করিতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সময়ে, এহেন গ্রন্থকারকে পাইয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এই গ্রন্থকারের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার হইবে।

যদিও বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন সর্ব্বজনাদৃত হইতেছে, কিন্তু চুটকি সাহিত্য ভিন্ন পয়সা দিয়া বড় কেহ পুস্তক ক্রয় করে না। হিষ্টরিক্যাল নাট্য, উপন্যাস বা [illegible] অধিক পরিমাণে [illegible]। এদেশের মাসিক পত্রিকা সকলও চুটকি সাহিত্যেরই অধিক প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কাব্য বা বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের সাদর অভ্যর্থনা এদেশে আশা করা যায় না। উৎসাহের অভাবে বড় কেহ এপথে আসিতে চাহেন না। কেহ দুই একবার আসিলেও আবার ফিরিয়া যাইয়া পূর্ব্বের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এইরূপ কঠোর সময়ে, যিনি, লাভালাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া, শুধু কেবল দেশের ঋণ পরিশোধের জন্য, কলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তিনি যে কি দরের ব্যক্তি, এক কথায় তাহা ব্যক্ত হইবার নয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষকে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

মহাভারত এদেশের এক অপূর্ব্ব জিনিস:—বুঝিবা পৃথিবীর মধ্যে এরূপ জিনিস আর কোথাও নাই। সকল শাস্ত্র, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শনের সারচুম্বক—মহাভারত। মহাভারতের সার, গীতা শাস্ত্র। বুঝি এই শাস্ত্রের সমীচীন ব্যাখ্যা করাই "শরশয্যার" উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের ক্ষমতা অসাধারণ—তিনি এই কাব্য প্রণয়নে যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, সম্যক রূপে অনুশীলিত হইলে, কালে তাহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।

৩৪। কাব্য কথা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, মূল্য ১॥০। কুমারসম্ভবের উমা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়, দানতত্ত্ব, "বিধুচূড়া" সমালোচনা, হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব, প্রাচীন পাঞ্চাল দেশ ও বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব, সেকালের পুলিস, বিরাটপুরী ও মৎস্য দেশ ও মহর্ষি কণ্ব, এই কয়েটী প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি চিন্তাশীলতার এক বিশেষ উপাদান। লেখা প্রাঞ্জল, ভাব সংযত, রুচি মার্জ্জিত এবং গবেষণা প্রভূত। আশা করি, সর্ব্বত্র এই পুস্তকের আদর হইবে।

বৈদিক সাহিত্য।

(রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত।)

স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে ভারতের যাবতীয় "সম্মিলন-ক্ষেত্রই" অতীব পবিত্র ও মহাফল-প্রদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চনদের সম্মিলন-ভূমিতে একদিন ভারতীয় আর্য্যঋষিকুল বৈদিকগাথা উচ্চারণ করিতে করিতে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" বলিয়া যজ্ঞে আজ্যধারা ঢালিয়া দিয়া সামাজিক কল্যাণের জন্য বিধাতার নিকটে স্তুতি করিয়াছিলেন। সেই সুপবিত্র পঞ্চনদের সম্মিলনভূমিতেই, সেই সুপবিত্র যজ্ঞক্ষেত্রেই, যে সুপবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান গগনভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছিল, বহুকোটী বৎসর পরে, সেই বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানই অদ্য পৃথিবীর সকল জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে এবং মনুষ্যজাতির মহাকল্যাণের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। অদ্যাপি গঙ্গা ও যমুনার সম্মিলনভূমি "প্রয়াগ" হিন্দুজাতির নিকটে কত আদরের ও পবিত্রতার ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বিবিধ ও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলন ক্ষেত্র "জগন্নাথ" অদ্যাপি হিন্দুজাতির চিত্তে ভেদবুদ্ধির বিলোপ সাধন করিয়া দিয়া, একটা মহান্ একত্বের সমাচার বহন করিয়া দিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, যেখানেই কোন কিছুর সম্মিলন, তাহাই পবিত্র এবং তাহাই বিবিধ কল্যাণ প্রসবের আকর বলিয়া, হিন্দুজাতির নিকটে পূজা পাইয়াছে। অদ্য সাহিত্য-সম্মিলনের শুভক্ষেত্রে, বঙ্গদেশের বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধীরচিত্ত, ধর্ম্মপ্রবণ মহাপুরুষবর্গ, একত্র সম্মিলিত। তাই অদ্য এই শুভ-অবসরে, আমাদের চিত্তে একথা স্বতঃই সমুদিত হইতেছে যে, এই মিলনের ভূমিও বঙ্গদেশে বহুকল্যাণের উৎস খুলিয়া দিতে সক্ষম হইবে। তাই, হৃদয়ের অকৃত্রিম আনন্দের সহিত, দূর হইতে, ভাবি-কল্যাণ কামনায়, সমবেত সাহিত্যিক বন্ধুবর্গণের সমক্ষে অদ্য আমরা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

জাতীয় সাহিত্য বলিতে কেবলমাত্র প্রচলিত সাহিত্যকেই বুঝায় না। প্রচলিত সাহিত্য যে মহাসাগরের একটী অংশমাত্র, প্রচলিত সাহিত্য যে মহান্ উৎস হইতে মূলতঃ সমুত্থিত হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা বিস্তৃতিলাভ করিয়া, অদ্য আপন পদে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে,—সেই উৎস, সেই মহাসাগর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কখনই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশেষতঃ যেস্থলে সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ একত্রিত, সে স্থলে প্রাচীন-সাহিত্যের সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করা আমরা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ করি।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক গ্রন্থের অত্যন্ত আদর ছিল। জননী যেমন নিরাশ্রয় শিশুটীকে আপন বক্ষে, যত্নের সহিত আবরণ করিয়া রাখেন, বৈদিকগ্রন্থগুলিকেও তাৎকালিক আর্য্যগণ, ততোধিক মমতা ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। ঋক্, যজু, সাম প্রমুখ বৈদিক গ্রন্থরত্নগুলির প্রতি এতই

আদর ছিল যে, ঐ সকল গ্রন্থ-নিবদ্ধ একটী শব্দও যাহাতে রূপান্তরিত না হইতে পারে, যাহাতে কালপ্রভাবে অন্তত্বারা একটীমাত্র শব্দও নূতন সংযোজিত বা বিযোজিত না হইতে পারে, তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি সতর্কতা অবলম্বিত হইত। পদপাঠ, জটাপাঠ প্রভৃতি প্রণালী অদ্যাপি সেই অসাধারণ সতর্কতার কথা ঘোষিত করিতেছে। •

বেদগ্রন্থের প্রতি কেন এত অসামান্য যত্ন ও সতর্কতা গৃহীত ও অবলম্বিত হইত? ইহার কি কোন কারণ নাই?

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ,ভারতের ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,সেই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়,তবে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতি ঋষিগণের সেই অসাধারণ যত্নের মূলে কোনই গুরুত্ব অনুভূত হয় না। ঋগ্বেদ, যদি কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাকৃতিক জড়শক্তির প্রতি ভীতি মিশ্রিত বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতিগাথা মাত্রই হয়, তবে কিজন্য আর্য্যগণ এমন করিয়া সেই গ্রন্থের সমাদর ও রক্ষাবিধান করিলেন? হিন্দুজাতি পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, ঋগ্বেদের তুল্য মহামহীয়ান্ বিরাট গ্রন্থ আর নাই। শাস্ত্রে এমন বিধান দৃষ্ট হয় যে, নিত্য নিয়মিত ভাবে যে গৃহে বেদগ্রন্থ পঠিত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সদৃশ এবং ব্রাহ্মণেরা যদি বেদ পাঠ না করেন, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। জড়শক্তির প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি স্তুতিগীতিই যদি বেদগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তবে তাহা নিত্য পাঠ করিবার জন্যই বা শাস্ত্রে এমন বিধান থাকিবে কেন? যাঁহারা জগত্তত্ত্বের অন্তস্তলদর্শী দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহারাও একবাক্যে ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের গৌরব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে ভুলেন নাই। কেন এমন হইল? বাস্তবিকই কি ঋগ্বেদে কেবল ভৌতিক পদার্থের স্তুতিগীতি নিবদ্ধ আছে?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদের উপরে যে প্রকার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যয়িত করিয়াছেন, কেহই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি, তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অগ্রে আমাদিগকে সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে হইবে।

ভারত হইতে যদিও বর্ত্তমানকালে, বেদের পঠন-পাঠন একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, তথাপি এখনও বৈদিককালের এমন গ্রন্থসমূহ বর্ত্তমান আছে, যাহা হইতে বেদ বুঝিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে অগ্রে সেই সকল উপকরণের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদে কি আছে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের স্বরূপ কি প্রকার, ঋগ্বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র, সূর্য্য, দ্যৌঃ, পৃথিবী, অশ্বিন, পূষা প্রভৃতি দেবতাবর্গ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে, এই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত বা স্তুতিগুলিরই বা অভিপ্রায় কি;—এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে, বৈদিকযুগের অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অদ্যাপি কয়েকখানি বৈদিককোষ প্রচলিত আছে। প্রচলিত দশ বা দ্বাদশখানি উপনিষদে বৈদিক দেবতাবর্গের উল্লেখ আছে। এবং দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেদান্তদর্শনের পূর্ব্ব-

মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা—এই দুই দর্শন গ্রন্থে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সমালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে, এই সকল গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক জড়পদার্থের স্তুতি দেখিতে পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের এই সিদ্ধান্ত যদি, বৈদিককালের অন্যান্য গ্রন্থোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়, তবে আমরা কেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? এইজন্যই আমাদের মনে হয় যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে অতি ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বৈদিক সময়ের অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

আমরা উপরে বৈদিককালের যে সকল কোষগ্রন্থ এবং উপনিষদের উল্লেখ করিলাম, সেই সকল গ্রন্থে বৈদিক দেবতা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার মীমাংসা পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ,বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত, পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের নিতান্তই বিরোধী। আমরা এই শুভ সম্মিলনক্ষেত্রে সমবেত সাহিত্যিক ধুরন্ধরগণের সম্মুখে বিনীতভাবে, দুইটী বিভিন্নমুখী পথের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা ঋগ্বেদের দেবতাদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য, এই দুইটী পথের কোন্‌টী গ্রহণ করিব? পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন,তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, না আমাদের দেশে চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে যে সকল বৈদিকগ্রন্থ ও বৈদান্তিক দর্শনগ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল গ্রন্থোক্ত পথই গ্রহণ করিব? আমরা সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই এই মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি। এ প্রকার শুভ অবসর হয় ত আর না মিলিতেও পারে।

বেদান্তদর্শনে ও বৈদিককালের গ্রন্থাদিতে দেবতাবর্গ সম্বন্ধে যে প্রকার মীমাংসা আছে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে শেষ মণ্ডল পর্য্যন্ত একটী বিরাট্ অদ্বৈত-বাদ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে।

কথাটা অনেকের নিকটে নূতন বোধ হইতে পারে। কিন্তু কি প্রমাণের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি,এস্থলে আমরা তাহা দেখাইব।

(১) ঋগ্বেদে উল্লিখিত "দেবতাবর্গের" স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈদিক অন্যান্য গ্রন্থে কি প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। কেন না, সমসাময়িক বা তাৎকালিক বৈদিক-গ্রন্থগুলি "দেবতা"বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, সেই মীমাংসাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। যে দ্বাদশখানি প্রামাণিক উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, সেই উপনিষদ্‌গুলির নানাস্থানে, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে এবং এই দেবতাবর্গের স্বরূপ এবং প্রকৃতি কি প্রকার, তদ্বিষয়েও বিশেষ আলোচনা আছে। উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক যুগেরই গ্রন্থ। সুতরাং ঋগ্বেদের দেবতাকে বুঝিতে হইলে, উপনিষদের মীমাংসাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তারপর, আর একটী বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। (২) বেদান্তদর্শনের মীমাংসাই বা দেবতাসম্বন্ধে কি প্রকার, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া

দেখিতে হইবে। বৈদিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্যই ত বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি। সুতরাং বেদান্তদর্শন,এই সকল দেবতা সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়াছেন, সেই মীমাংসা গ্রহণ করিলে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার প্রকৃতি অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে। (৩) নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত নামে দুইখানি অতি প্রাচীন বৈদিক অভিধান আছে। ইহারাও বৈদিকযুগেরই গ্রন্থ। এই কোষগ্রন্থে, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং দেবতাদিগের স্বরূপ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গকে বুঝিতে হইলে, এই কোষগ্রন্থের মীমাংসাকেও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। (৪) অবশেষে,ঋগ্বেদেই বা দেবতাবর্গ কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতাসম্বন্ধেই বহুপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন সূক্ত আছে, এই সূক্তগুলিতে দেবতাবর্গের প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদে উল্লিখিত অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, স্বয়ং ঋগ্বেদের মীমাংসাও গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা উপরে স্থূলতঃ যে চারিপ্রকারের প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট। শ্রোতৃমণ্ডলী দেখিতে পাইবেন যে, উপরি উক্ত চারিপ্রকার প্রমাণের কোন প্রমাণের দ্বারাই ঋগ্বেদ যে জড়শক্তির উপাসনার গ্রন্থ, একথা পাওয়া যায় না। বরং অনিবার্য্যরূপে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়া পড়ে যে, ঋগ্বেদে এক ব্রহ্মপদার্থই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং একটী বিরাট্ অদ্বৈতবাদই ঋগ্বেদের মহান্ লক্ষ্য।

এখন আমরা একে একে উপরি-উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এবং এই আলোচনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ঋগ্বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

উপনিষদ্‌গুলির নানা স্থানে, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে। আমরা সংক্ষেপে দুই তিনটী স্থল প্রদর্শন করিব। কেনোপনিষদে আমরা একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই। কতকগুলি অসুরকে পরাজয় করিয়া, দেবতাবর্গের চিত্তে একটা উৎকট গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবর্গ, আপনাদিগের সামর্থ্যের ও শক্তির গৌরব ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের ন্যায় পরাক্রমশালী আর কেহই জগতে নাই। একদা আকাশমণ্ডলে একটা অলৌকিক জ্যোতির আবির্ভাব হইল। এই জ্যোতিটী কি, জানিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র, প্রথমতঃ অগ্নিকে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি জ্যোতির নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি আকাশমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। সেই নারীমূর্ত্তি, অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্নি সদর্পে উত্তর দিল যে—"আমি জাতবেদা নামে, অগ্নিনামে, বিশ্বে বিদিত এবং আমি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করিয়া দিতে পারি।" অগ্নির এবম্বিধ উৎকট গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই নারীমূর্ত্তি হাস্য করিয়া এক তৃণখণ্ড দেখাইয়া দিয়া অগ্নিকে বলিলেন—"হে জাতবেদা। হে অগ্নে, তুমি এই সম্মুখবর্ত্তী তৃণ খণ্ডকে দগ্ধ করিয়া ফেল ত!" অগ্নি আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ

করিয়া সেই তৃণ খণ্ডটীকে দগ্ধ করিতে পারিল না। অগ্নি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ইন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া গেল। অগ্নির পরে, বায়ু আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নির ন্যায়, বায়ুও সেই তৃণ খণ্ডটীকে আপনার সমগ্র বিক্রম প্রয়োগ করিয়াও উড়াইতে পারিল না। এইরূপে দেবতারা একে একে পরাজিত হইলে পর, ইন্দ্র সেই নারীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই নারী ইন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যে, দেবতাবর্গ বৃথা আত্মসামর্থ্যে গর্ব্বিত হইতেছে। দেবতাবর্গের কাহারই নিজের কোন শক্তি নাই। ব্রহ্মশক্তিতেই উঁহাদিগের শক্তি। ব্রহ্মশক্তি ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র শক্তি থাকিতে পারেনা। আমরা এই আখ্যায়িকা হইতে এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হইতেছি যে, অগ্নি, সূর্য্যাদি কোন বস্তুরই ব্রহ্মশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' শক্তি নাই। অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতাবর্গের মধ্যে এক ব্রহ্ম শক্তিই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম শক্তিতেই উঁহাদিগের শক্তি,—উঁহাদের স্বীয়, 'স্বতন্ত্র' কোন শক্তি নাই।

বৃহদারণ্যকেও আমরা প্রকারান্তরে এই তত্ত্বেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। সে স্থলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি ৩৩টী দেবতা, এক প্রাণ শক্তি হইতেই উদ্ভূত। উহারা এক প্রাণ শক্তিরই বিবিধ বিকাশ মাত্র; সুতরাং বস্তুগত্যা দেবতার সংখ্যা একটী মাত্র। এস্থলেও আমরা এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হইতেছি যে, সূর্য্যাদি কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। প্রাণ শক্তির সত্তাতেই সূর্য্যাদির সত্তা। এক প্রাণ শক্তিই সূর্য্যাদি দেবতার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের "সংবর্গ বিদ্যা"তেও ঠিক অবিকল এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংবর্গ-বিদ্যায় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাহিক সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা এক প্রাণশক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, আবার সেই প্রাণশক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং প্রাণশক্তি ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিও এক প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং মৃত্যুকালে সেই প্রাণ শক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং আমরা এস্থলেও দেখিতে পাইতেছি যে, বাহিক ও আভ্যন্তরিক যত কিছু শক্তি বা পদার্থ, সকলই এক মাত্র প্রাণশক্তিকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে এবং এক প্রাণ শক্তিই ইহাদিগের সকলের মধ্যে অনুস্যূত। প্রাণশক্তি ব্যতীত, ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই।

এই প্রকারেই, উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে দেবতাবর্গের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব, আমরা দেবতা সম্বন্ধে, উপনিষদ গ্রন্থের এই মীমাংসাই প্রাপ্ত হইতেছি যে,—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গের মধ্যে এক প্রাণ শক্তি বা ব্রহ্মশক্তিই অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই ব্রহ্মশক্তিতেই দেবতাদিগের সত্তা। ব্রহ্ম শক্তি ব্যতীত কোন দেবতারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উপনিষদের এই মীমাংসারই বা তাৎপর্য্য কি?

কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে বেদান্তদর্শনে প্রবেশ করিতে হইবে। এখন আমরা তাহাই দেখিব।

বেদান্তদর্শনই বৈদিক সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসাত্মক গ্রন্থ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে

প্রণালীতে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহারই সর্ব্বাধিক আদর। বেদান্ত-দর্শনে সর্ব্বপ্রথমেই দুইটী কথা পাওয়া যায়। এক পরমার্থ দৃষ্টি, অপর ব্যবহারিক দৃষ্টি। যাঁহারা পরমার্থ দৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী,—তাঁহারা এই জগৎকে এক ভাবে দেখিয়া থাকেন। আর যাহারা সাধারণ অজ্ঞানী জীব, তাহারা এ জগৎকে অন্যভাবে দেখিয়া থাকে।

তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এজগতে কেবলমাত্র এক ব্রহ্মসত্তারই দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সূর্য্য, চন্দ্র, তরুলতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থ লইয়াই এই জগৎ। পরমার্থদর্শী পুরুষগণ, কোন পদার্থেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা দেখিতে পান না। তাঁহারা জানেন যে, সকল বস্তুর মধ্যেই এক ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, এই ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা; কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই।

কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক, তাহারা এরূপে জগৎকে দেখিতে পায় না। তাহারা প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা ব্রহ্ম সত্তার কোন খবর রাখে না।

আমার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন—স্বর্ণ হইতে হার, বলয়, কুণ্ডল ও মুকুট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে স্বর্ণকে 'কারণ' বলা যায় এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে 'কার্য্য' বলা যায়। 'কারণ' ও 'কার্য্য'—এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি প্রকার? কার্য্যগুলি—কারণেরই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা রূপান্তর—একটা আকার মাত্র। একটা বিশেষ আকার ধারণ করিলেই কারণটী নষ্ট হইয়া যায় না, কারণটী আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণেরই একটা বিশেষ অবস্থা,—একটা রূপান্তর,—একটা আকার বিশেষ মাত্র।

(ক) অজ্ঞানী, সাধারণ লোক মনে করে যে,—স্বর্ণই হার, বলয়, মুকুটাদি পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা প্রত্যেকে এক একটা 'স্বতন্ত্র' 'স্বাধীন' পদার্থ। স্বর্ণই যে হার, বলয়, কুণ্ডলাদির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, সে দিকে আর সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হার, বলয়াদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণের যে স্বীয় অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—একথাটী লোকে ভুলিয়া যায়। তাহারা ঐ সকল হার, বলয় প্রভৃতি আকারকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই বোধ করিয়া থাকে। ইহারই নামে ব্যবহারিক দৃষ্টি।

(খ) কিন্তু যাঁহারা পরমার্থদর্শী, বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা এরূপ ভ্রম করেন না। তাঁহারা জানেন যে,—হার, বলয়, কুণ্ডলাদি 'স্বতন্ত্র' 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। উহারা স্বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন 'আকার' মাত্র। স্বর্ণেরই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকার অবস্থিত; স্বর্ণেরই সত্তা উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্ণকে তুলিয়া লও, দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল আকারও চলিয়া গিয়াছে। যখন স্বর্ণকে তুলিয়া লইলে, হারাদি আকার গুলি থাকে না, তখন ঐ আকারগুলি নিশ্চয়ই 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। স্বর্ণ-সত্তাতেই হারাদি-আকারগুলির সত্তা। স্বর্ণসত্তা ব্যতীত, হারাদির কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং স্বর্ণের সত্তাই প্রকৃত সত্তা। হারাদি

আকারগুলি আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ মাত্র। ইহারই নাম পরমার্থ দৃষ্টি।

বেদান্তদর্শনে, এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা আগাগোড়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরমার্থ দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপেই জগতের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব-পদার্থে এক ব্রহ্মসত্তাকে দেখিতে পান।

"বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং 'তদিদং সর্ব্বং' মিত্যুচ্যতে। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"—বেদান্ত-ভাষ্য।

সুতরাং বেদান্তদর্শন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলি কেহই "স্বতন্ত্র" কোন পদার্থ নহে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যুত রহিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তাতেই ইহাদের সত্তা। ইহাদের স্বীয় কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

সুতরাং সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি বস্তুগুলি, ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। ইহারা ব্রহ্মসত্তাতেই সত্তাবিশিষ্ট, সুতরাং সূর্য্য, অগ্ন্যাদির স্তুতির অর্থ—এক ব্রহ্মসত্তারই স্তুতি।

আমরা উপনিষদ এবং বেদান্তদর্শন—উভয় স্থলেই দেবতা সম্বন্ধে এই প্রকার মীমাংসাই পাইলাম।

বেদান্তদর্শনে, দেবতা সম্বন্ধে আরও এক প্রকার মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিন পাদে আমরা কতকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। শ্রুতিতে, আকাশ, প্রাণ, বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল; এই শব্দগুলি কি জড়ীয় পদার্থ বাচক, না এ গুলি ব্রহ্মবাচক,—ইহারই মীমাংসার জন্য এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ যে স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে যদি কোন "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" থাকে,—অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিচায়ক কোন বিশেষণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ কোন জড়ীয় বস্তুকে বুঝাইতেছে না, ইহারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে এবং এই সকল শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন। বেদান্ত-দর্শন, প্রথম দুই অধ্যায়ে এই মীমাংসাই করিয়া দিয়াছেন। এই মীমাংসা করিয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, আকাশ, প্রাণ, প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মেরই, বাচক, অন্যকোন জড়ীয় পদার্থের বাচক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখান হইয়াছে যে,—"এই বিশ্ব প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাণেতেই স্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়ে প্রাণেতেই লীন হইয়া যাইবে।" এস্থলে, অতি সুস্পষ্ট ভাবে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন না, সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের মূল কারণ ব্রহ্মব্যতীত কেহই হইতে পারেন না। সুতরাং এই সকল স্থলে "প্রাণ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা বেদান্তদর্শনের এই একটী মীমাংসা দেখিতে পাই।

এই মীমাংসাটী মনে রাখিলে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দের স্বরূপও আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা যদি ঋগ্বেদে, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার সূক্তগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে প্রায় সকল সূক্তেই "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিবিধ বিশেষণ দেখিতে পাই। সুতরাং

এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠে যে,—ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দ কোন জড়ীয় শক্তিকে বুঝাইতেছে না। এই সকল শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দুই একটী সূক্তের উল্লেখ করিয়া এস্থলে দেখাইব যে, ঐ সকল সূক্তে যথেষ্ট রূপে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—

"বনেষু ব্যন্তরীক্ষং ততান, বাজমর্ব্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্সু্অগ্নিং, দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ॥"

এই সূক্তে বরুণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে,—এই বরুণ দেবতাই বৃক্ষের উর্দ্ধদেশে অন্তরীক্ষকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, ইনিই অশ্ব সকলের মধ্যে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, ইনিই গাভীস্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ইনিই অর্পণ করিয়াছেন। ইনিই জলে অগ্নি এবং পর্ব্বতে সোমকে সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। ইনিই আকাশমণ্ডলে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন।

হে সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী। আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখুন, বেদান্তদর্শনের যে "ব্রহ্মলিঙ্গের" কথা মীমাংসা করা হইয়াছে, এই সূক্তে বরুণ-দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল গুলিই ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ কি না?

এতএব আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বরুণ' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন; কোন জড়ীয় ভৌতিক পদার্থ প্রতিপাদিত হইতেছে না। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এই কথা বুঝিতে হইবে।

এখন আমরা ঋগ্বেদে দেবতাদিগের কি প্রকার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী সূক্তের উল্লেখ করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। তদ্দারাও দেখিতে পাইবেন যে, এক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং অদ্বৈতবাদই ঋগ্বেদের লক্ষ্য। কোন জাতীয়শক্তির স্তুতি করা ঋগ্বেদের লক্ষ্য নহে।

'ইন্দ্রং' মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু, রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান।
একং "সৎ" বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

প্রথনমণ্ডলের অন্তর্গত এই বিখ্যাত সূক্তে, ঋষি দেবতাবর্গের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঋষি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—একই 'সত্তাকে' পণ্ডিতেরা বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক ব্রহ্মসত্তাই—কখনও অগ্নি নামে, কখনও ইন্দ্র নামে, কখনও বা বরুণ নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই সত্তাই সুপর্ণনামে পরিচিত। এই সত্তাকেই পণ্ডিতেরা মিত্র নামে ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামে স্তব করিয়া থাকেন।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ঋষি ইহা জানিতেন যে, একই ব্রহ্মসত্তা—অগ্নি, সূর্য্য, মিত্র প্রভৃতির মধ্যে অনুস্যূত। অগ্নি, সূর্য্য, মিত্র প্রভৃতি কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই ইহাদের সত্তা। সুতরাং অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির স্তুতি দ্বারা ঋষি সেই অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তারই স্তব করিতেছেন।

সূক্তগুলির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে, দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেবতারই বিশেষণস্বরূপে, "ঋতাবৃধা," "ঋতস্পৃশ," "ঋতাবানঃ," "ঋতস্যনাভিঃ," "অমৃতস্য যোনি," "অমৃতধাম"—এইপ্রকার বিশে-

ষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋত এবং অমৃত শব্দের অর্থ—অবিনাশী, অপরিণামী ব্রহ্মসত্তা বা কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই সকল শব্দদ্বারা স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি 'কার্য্য' বর্গের মধ্যে একটী "ঋত" বা "অমৃত"—অর্থাৎ অবিনশ্বর কারণ-সত্তা (ব্রহ্মসত্তা) অনুস্যূত রহিয়াছে। সূর্য্য, বরুণাদি দেবতাবর্গ সেই অবিনশ্বর কারণসত্তাকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে;—সেই কারণ-সত্তা দ্বারাই দেবতাবর্গ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে; সেই কারণ-সত্তাই দেবতাবর্গের নাভিস্বরূপে অবস্থিত।

অতএব আমরা, এই সকল বিশেষণ দ্বারাও বুঝিতে পারিতেছি যে, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের ঋষিগণের লক্ষ্য এবং উপাস্য বস্তু।

দেবতাবর্গের মধ্যে অনুস্যূত কারণসত্তা-বা ব্রহ্মসত্তাই যে ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু, তাহা অন্যরূপেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক ইন্দ্রকেই, সূর্য্যরূপে, রুদ্ররূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার, সূর্য্যকে বর্ণনা করিতে গিয়া সূর্য্যকেই, বায়ু-নামে, বরুণনামে, ইন্দ্রনামে আহ্বান করা হইয়াছে। সকল দেবতাতেই এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেন এরূপ করা হইল? দেবতারা যদি 'স্বতন্ত্র', 'স্বতন্ত্র' জড়ীয় পদার্থই হয়, তবে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া আহ্বান করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ঋষিগণ কার্য্য কারণের সম্বন্ধের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, একই কারণ-সত্তা, বিবিধ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাকার ধারণ করাতেও, কারণসত্তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ঘট-শরাবাদি বিবিধ আকার ধারণ করিলেও, মৃত্তিকার সত্তা ঠিক্‌ই থাকে।

সুতরাং দেবতাবর্গের এই প্রকার বর্ণনা দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্র-চন্দ্রাদির মধ্যে অনুস্যূত কারণসত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য বস্তু। ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাবর্গের, কারণ-সত্তাতিরিক্ত 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। সুতরাং পরমার্থতঃ, ইন্দ্রচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি—কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। পরমার্থদৃষ্টিতে, দেবতারা সেই এক ব্রহ্মসত্তা মাত্র। এই ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের উপাস্য তত্ত্ব।

আর একটী কথা দেখিলেও, এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঋগ্বেদে যে পুরুষসূক্ত আছে, তাহাতে সূর্য্য, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গ, পুরুষের "অঙ্গ"রূপে বা অবয়ব-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গীর সত্তাতেই অঙ্গগুলির সত্তা। অঙ্গগুলির 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই। অঙ্গী এবং অঙ্গের মধ্যে ইহাই সম্বন্ধ। সুতরাং দেবতাবর্গকে পুরুষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহাই আসিয়া পড়িতেছে যে, পুরুষের সত্তাতেই দেবতাবর্গের সত্তা; দেবতাবর্গের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই ভাবে, পুরুষ-সূক্ত সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছে যে, এক পূর্ণপুরুষেরই সত্তা, সূর্য্যাদি দেবতাদিগের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। সুতরাং দেবতাবর্গের স্তুতি—সেই অনুস্যূত পুরুষ-সত্তারই স্তুতিমাত্র। এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্যই, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং মনুষ্যের চক্ষুমধ্যস্থ পুরুষ, একই বস্তু। মাণ্ডুক্যোপনিষদেও এইজন্যই, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক বস্তুগুলিকে অভিন্ন বলিয়াই

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ নির্দ্দেশের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, একই সত্তা বাহিরে ও ভিতরে বিবিধভাবে বিকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তি বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুদাদি আকারে অবস্থিত, সেই শক্তিই মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, অন্তঃকরণাদিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত "মধুবিদ্যা"তেও এই মহাতত্ত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। মধুবিদ্যায় এই কথাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে পুরুষসত্তা সূর্য্যে অবস্থিত, তাহাই অগ্নিতে অবস্থিত, যে পুরুষ-সত্তা অগ্নিতে অবস্থিত, তাহাই বাক্যে অবস্থিত, যে পুরুষসত্তা চন্দ্রে অবস্থিত, তাহাই জীবের মনে অবস্থিত। এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি? এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, একই ব্রহ্মসত্তা, বাহিরে ও ভিতরে বিবিধ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেই সত্তাব্যতীত কোন আকারেরই (বস্তুরই) 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই সকল কথাদ্বারা এই মহাতত্ত্বই উদ্‌ঘাষিত হইতেছে। সুতরাং আমরা বৈদিকযুগের এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতেছি যে, দেবতাবর্গের সত্তা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার উপরেই অবস্থিত। অতএব ঋগ্বেদের দেবতার স্তুতি,—ব্রহ্মসত্তারই স্তুতিমাত্র।

ঋগ্বেদে আর একশ্রেণীর সূক্ত আছে। তদ্বারাও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। এই শ্রেণীর সূক্তগুলিরও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। সপ্তমমণ্ডলে কতকগুলি "বামদেবীয় সূক্ত" আছে। ঋষি বামদেব সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া, আপন আত্মাতে সকল পদার্থের অনুভব করিতেছেন। 'আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি, আমিই বসুরূপে ক্রিয়া করিতেছি' —এই প্রকার সূক্তগুলি অতীব স্পষ্টভাবে সেই পূর্ণ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মসত্তার কথাই ঘোষণা করিতেছে। দশমমণ্ডলেও "বাক্-সূক্ত" নামে অবিকল এইরূপ একটী সূক্ত আছে। সেস্থলেও, ঋষিকন্যার সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মভাব উদিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। সেস্থলেও বলা হইয়াছে,—"আমিই সূর্য্যরূপে, বসুরূপে, চন্দ্ররূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, আমিই বায়ুরূপে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছি" ইত্যাদি। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতির মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা অবস্থান করিতেছে, আমার ভিতরেও সেই ব্রহ্মসত্তাই অবস্থিত আছেন, এই বোধ না জন্মিলে কখনই—"আমিই মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি, আমিই বায়ুরূপে সঞ্চরণ করিতেছি"—এপ্রকার উক্তি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল সূক্তের দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ঋগ্বেদে ব্রহ্মসত্তাই উপাস্য বস্তু। সূর্য্য, চন্দ্রাদি পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই, সূর্য্যচন্দ্রাদি বিবিধ নামে স্তুত ও গীত হইয়াছেন। কার্য্যদর্শনে কারণসত্তার অনুভূতিই ঋগ্বেদে উপদিষ্ট।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা বোধ করি ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদে কোন জড়ীয় ভৌতিক বস্তু উপাস্য বলিয়া স্তুত হয় নাই। সূর্য্য-চন্দ্রাদিতে অনুস্যূত চেতন ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র স্তুত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মুখ্যভাবে ব্রহ্মবস্তুর উপাসনা না বলিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূতরূপে কেন ব্রহ্মবস্তু নির্দ্দেশিত হইলেন? ইহার কি কোন কারণ নাই?

বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য তাহা-

রও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। ব্রহ্ম—প্রকৃতির অতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। মন সেখানে যাইতে পারে না, বাক্য সেখানে পৌঁছিতে পারে না। সাক্ষাৎভাবে তাহাকে কেবল 'নেতি নেতি' ব্যতীত অন্য প্রকারে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে উপায় কি? যদি তিনি মন ও বাক্যেরই অতীত হইলেন, তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই বা মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে কিরূপে? এ বিষয়ে, বেদান্তের মীমাংসা এই যে, যদিও স্বরূপতঃ মুখ্যভাবে ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করিবার উপায় নাই বটে, তথাপি "লক্ষণা" দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। লক্ষণা অর্থ এই যে, জগতের সম্বন্ধেই কেবল তাঁহাকে জগতের সাক্ষীরূপে জানিতে পারা যায়। আমরা জগতে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখিতেছি। এই সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার অন্তরালে, ইহাদের সাক্ষীরূপে, ব্রহ্মকেও জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, জগতে অভিব্যক্ত বিবিধ কার্য্য দর্শনেই ব্রহ্মেরও স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতুবা কার্য্যবর্গকে বাদ দিলে, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার কোনই উপায় নাই। এই জন্যই বেদান্তে ও গীতায়, এই জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও এই জন্যই—"এতাবানস্য মহিমা" বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মেরই 'মহিমা' রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

অতএব, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, ঋগ্বেদে কেন মুখ্যভাবে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত না হইয়া, অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতার মধ্যে অনুস্যূত রূপে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত হইয়াছেন? কার্য্যদর্শনেই কারণের সত্তা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ঋগ্বেদে আগাগোড়া ব্রহ্মসত্তা সূর্য্যাদি বিবিধ নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন।

নিরুক্তকার মহামতি যাস্কাচার্য্য তারস্বরে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "আত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা। অন্যান্য দেবতাবর্গ সেই এক আত্মারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানীয়।"

আমরা এই সকল সিদ্ধান্ত ভুলিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনুসরণ করিয়া বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, ইহার তুল্য ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋগ্বেদকে আমরা, জড়ীয় পদার্থের স্তুতিপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া হতাদর করিতে শিখিতেছি!! হা! দুরদৃষ্ট!! সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার কি কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন না? ওঁ তৎসৎ। শিবমস্তু।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচর্য্য।

মা।

১

আমার জনমভূমি, এতকাল ধরে
যাপিনু তোমার বক্ষে , বিপুল তৃষ্ণায়
মা বলে ডাকিনু তোবে মন প্রাণ ভবে—
হৃদয়ে অতৃপ্তি তবু রহিল কোথায় !
এখন যাইতে হবে—এই মনে হয়,
চারিদিকে কাল ছায়া আসে ঘনাইয়া !
এত রূপ এত প্রীতি গীতি সুধাময়
অয়ি মা কাহাব তবে যাইব রাখিয়া ?
মা তোর মোহিনী উষা, সন্ধ্যা সুরঙ্গিণী,
মা তোব বাঁশের কুঞ্জ, উদার প্রান্তর,
মা তোব হৃদয় জোড়া পাহাড়ের শ্রেণী,
মৃদু কুহেলিতে ঢাকা শ্যামল নধব,
মা তোর শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তিব প্রান্তরে
সূর্য্য করে ঝলমল সমুদ্রের সীমা,
নিশীথেব নিরাবিল স্তব্ধতা-সাগরে
জ্যোতিস্ফুট সহস্রাক্ষ নভের মহিমা,
তরুচ্ছন্ন পল্লিপথ, বিমল তটিনী,
ক্লান্তির কোমল শয্যা স্নেহে টলমল—
এর মাঝে কোথা আছে গোপনে না জানি,
প্রাণের ক্ষুধার অন্ন, তিবিষার জল।
এর মাঝে আছে তোর কোমল হৃদয়—
বিগ্রহ অন্তরে দেবী অন্তরমোহিনী !
ধমনী মরমে যাব অন্তর্ব্বহা বয়
নিত্যস্থির, ভূতপূর্ব্বীচ্ছায়া নিবাসিনী।

অতি স্নেহময়ী তুই, পুতুল যে চায়
তারে তাই দিয়ে মাগো রাখিস্ ভুলায়ে,
যে কাঁদে সকল ত্যজি কেবল তাহায়
আপন বুকের মাঝে নিস্ মা টানিয়ে।

আমি কি চেয়েছি মাগো,ধূলি কুড়াইয়া,
ঘুরি নাই এতকাল সংসারের পথে
তুই যদি স্নেহ ভরে দিলি জাগাইয়া
হৃদয়ে টানিয়ে নে মা গোপন অমৃতে।

দেখালি মন্দিব তোর, অপদেবতার
পূজা করি রিক্ত যবে হৃদয়েব থাল ;
দেখাইলি বাঞ্ছিতেরে,যখন আমার
হৃদয় ফুলের মধু হরিয়াছে কাল !

বুঝিয়াছি সাব সত্য প্রাণেব মহলে—
যেই পারে সেই জন কত ভাগ্যবান,
মানব জীবন পেয়ে জাগিয়া সকালে
সুধা-সাগরের তীরে যাত্রার বিধান।

বুঝিয়াছি, অতর্কিতে গিয়াছে গলিয়া
সময় সুবিধা শক্তি ধৈর্য্য সাধনার ;
যে আগুন স্বর্গ হতে এসেছি বহিয়া
প্রতিষ্ঠা জীবন-যজ্ঞে হয় নাই তার।

বুঝিয়াছি, কিসে তার করেছি যোজনা—
সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ জীবিকার খেলা !
কে বুঝে অন্তরে কত বৃশ্চিক যাতনা,
হতলক্ষ জীবনের অনির্ব্বাণ জ্বালা।

দিয়েছিলে, সুনির্ম্মল প্রাণের আরশী,
দিয়েছিলে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রফুল্ল জীবন,
দিয়েছিলে ধ্যানে ধৈর্য্য ভাষা গরীয়সী ;
করেছিলে শত শত সৌভাগ্য ঘটন।

শুধু এই সত্য হল—জীবন ব্যাপিয়া
বসন্তের অগণিত মঞ্জরী সম্ভার,
দু'দিনের মাঝে যায় ফুটিয়া গলিয়া,
ফলে পরিণত হয় দু একটী তার !

এই মা বুঝেছি শুধু দুঃখ দারিদ্র্যের,
কঠোর পীড়নে যবে ক্ষুভিত পরাণ,
তখনি পেয়েছি তোরে; সুখ বিলাসের
উত্তাপে দেখেছি সদা তোর অন্তর্দ্ধান!

চাহিনা নিষ্ফল দুঃখে অনুতাপানলে,
তাপিতে এ মহোদয় দুর্লভ জীবন—
বিপুল বিশ্বের স্রোতে পারে কয়জন?
সকলের মাঝে আমি অতি সাধারণ।

মাগো বুঝিতেছি যেন কিসের আভাষ,
পাইতেছি অন্তরঙ্গে, নহে পরিচয়।
মনের মৃদ-বেদী-প'রে জ্যোতির প্রভাস—
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।

শুধু এই চাই মাগো, তাই দেও মোরে
যাহা বুঝি ছায়াময়ী অনুভূতি ঘোরে,
নিবিড় নীরবস্পর্শ হৃদয়ে যাহার
লুকায়,ধরিতে গেলে আঁচলে ভাষার!
আমার মাঝারে যাহা স্থির অনশ্বর,
অনলে দহেনা যাহা, নাহি হরে কাল,
অতল তরঙ্গহীন সুধার সাগর,
মনের বসনে যাহা অনন্ত রসাল;

যাহা বুঝি ফুলে পত্রে আকাশে বাতাসে;
যাহা বুঝি সমুদ্রের বিপুলে বিস্তরে;
নিত্য নিত্য উষা সন্ধ্যা যাহা লয়ে আসে,
যাহা বুঝি ভাষ্যহীন বিশ্ব চরাচরে;

যাহা বুঝি পর্ব্বতের সমুচ্চ নিবিড়ে,
যাহা বুঝি নিত্য সত্য ঋতু আবর্ত্তনে,
যাহা বুঝি স্তব্ধ হয়ে সজনে বিজনে,
যাহা বুঝি হৃদয়ের অতল গভীরে!

২

এ হৃদয় সিন্ধু মম বুঝিয়াছি আমি—
যত ডুবি তত পাই গভীরতা যার;
বিজন গহন দেশ, গুপ্ত মণি তুমি
আমারি ভিতরে, নাহি মম অধিকার!
উপরে জড়তা বশে বালকের মত
লহরী প্রপঞ্চে মজি ছিনু এতকাল,
বুঝি নাই ও অতল গাম্ভীর্য্য সংযত,
তাহারও বহুমুখী বেদনা উত্তাল!
আজি যদি ধন্য কৈলে, দেখালে নিশীথে
তব কামদুখাযুষ্ট গুপ্ত ছায়া পথ,
যায়না বুজিয়া যেন দিবার আলোতে,
সে পথে নিয়ত যেন চলে মনোরথ!
জ্যোতির্বিন্দু সমাকীর্ণ সুধাসিক্ত বীথি
সুরভির পন্থা ধরি যাহে দ্রষ্টাগণ
নিত্য নিত্য আবরণ করেন লঙ্ঘন;
—শিশু সম হৃদয়ের পরম আরতি।

৩

আমারে সময় দাও, মজিয়া রসিয়া
তত্ত্বকীট,সমস্থির হৃদয় নিভৃতে,
অলোকের সীমা হতে কুসুম ধরিয়া
বাণীর হিরণ্য কোষে আবরি তুলিতে!
প্রতি তত্ত্ব অন্তর্লীন জ্যোতির আভায়
উদ্ভাসিত হয় যেন ভিতরের হতে,
পবিত্র নীরজ শান্ত যে চাহে মজিতে
প্রথম দেখায় যেন তার আভা পায়!
আমারে হৃদয় দাও সদা দীপ্ত থাকে;
দৃপ্ত নাহি হয় যেন আত্ম মহিমায়;
যাহারা ঘুরিয়া মরে সংসারের পাকে
অজ্ঞাত সৌরভ যেন অতর্কিতে পায়।
এ বিশ্ব আমারে দাও, নিশ্চিন্তে বসিয়া
এ বিকচ পুষ্পে করি মধুর সঞ্চয়;
সে মধু পরের তরে ভাণ্ডার ভরিয়া
রেখে যাই,যবে আসে যাবার সময়!

৪

আমারে কি নিবি মাগো তোর বক্ষঃস্থলে,
ফুটে যথা ফুল গুপ্ত প্রেমের বাঁশীতে?

সঙ্গীতের মর্ম্ম হতে সৌরভ উথলে —
বিলায়ে রাখিবি মোরে ফুলের হাসিতে ?
আমারে কি নিবি না গো, রাখিবি জাগায়ে,
তরল মৌক্তিক হাস্য বিকসিত মুখে
প্রাণের আবেগ-বিভা তরঙ্গ ছুটায়ে,
ঝাঁপে যথা 'কর্ণফুলী' সাগরের বুকে।
আমারে কি রাখিবি না তোর তপোবনে
লুকাইয়া প্রাণদান মহা স্তব্ধতায়,
মা তোর সাধক যারা তারা নিরজনে
ধেয়ানে ডুবিলে যেন মোরে দেখা পায়।
যুগে যুগে কত নর আসিবে যাইবে,
ফুটাইবে ভাবরস সৌন্দর্য্য-গরিমা,
সবার অগম্য দেশে সংপ্রজ্ঞাত পুরে,
আমারে কি চিরকাল রাখিবিনে ওমা।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

মেবার পতন।

(গ্রন্থের একটী শিক্ষা)

কিসের শোক করিস ভাই। আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।

যে উত্তেজনায় ক্লিষ্টতা নাই, বরং যাহা মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তোলে, সেই উত্তেজনা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি গানের প্রাণ। আমাদের আত্ম-অভিমানের মোহ এখনো কাটে নাই, তাই এখনো আপনাদের দোষ, পরের ঘাড়ে চাপাইয়া, পর-বিদ্বেষে আপনাদের চিত্ত নিরন্তর কলুষিত করিতেছি। আমার কপালে যে সাংসারিক উন্নতি ঘটিল না, সেকি "কেবল ফেল্লাম বলে জন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলায় ?" আত্ম-প্রতারিতেরা মনে করে যে, তাদের ঘরের ছেলেরা পাড়ার দশজনের দোষেই বয়ে যায়, অধম কাপুরুষেরা মনে করে যে, চক্ষুশূন্য একটা গ্রহের দৃষ্টিতে, অথবা বর্ব্বর সংস্কারের একটা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষেই তাহাদের যত অধোগতি। এই মোহে, ভ্রান্তিতে, কুসংস্কারে, আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাই না। শিশু আছাড় খাইয়া পড়িলে মাটীতে পদাঘাত করিয়া ব্যথা ভোলে, শিশুর পিতা পিতামহেরাও সেই পদ্ধতিতে পরকে গালি দিয়া আর্য্যগৌরব-সুখ অনুভব করেন। কবি এই আত্মপ্রতারিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

পরের পাপে কেন এ রোষ,—নিজেরি যদি শত্রু হোস্ ?
তোদের এ যে নিজেরি দোষ, আবার তোরা মানুষ হ।

ভারতবর্ষ যে একদিন ভারি বড় ছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের দেশের যে সাধারণ বিশ্বাস আমাদের দেশের মত দেশ নাই, আমাদের জাতির মত জাতি নাই, সে কি কোন প্রাচীন কালের যথার্থ গৌরবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ? অবর্ণাচারী লোকেরাও বলে যে, তাহাদের মত শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীতে নাই, তাহারা যে কেন শ্রেষ্ঠ, সে কথা তাহারা বুঝাইতে পারে না। সকলের প্রাণের প্রতি মমতার মত, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের এই অভিমান, সকল জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বরং যে জাতি বা লোকসাধারণ যত বেশি মূর্খ, তাহাদের মধ্যেই এই বিশ্বাস তত অধিক। আমাদের দেশের যে

শ্রেণীর লোক, বিদেশের সাহিত্য এবং অবস্থার সহিত অত্যন্ত অপরিচিত, তাহারাই আপনাদের অত্যন্ত গৌরব বেশি বিশ্বাস করে। যে কারণে আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার কথা, প্রাচীনের সে কাহিনী ত সে দিন পর্য্যন্তও এদেশে সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যে সাহিত্যে অতি প্রাচীনকালের স্বাধীন চিন্তা, সুশিক্ষা এবং চরিত্রনিষ্ঠার ইতিহাস পাই, তাহাত এখনো রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়া ইউরোপেই পড়িয়া আছে। মৌর্য্যকুলের গৌরব ত ইংরেজের যত্নে সেদিন প্রকাশিত হইয়াছে, গুপ্ত সম্রাটদের মহিমাও এখনো ফ্লীট সাহেবের খোদিত লিপি-গ্রন্থে ডুবিয়া আছে। বৃথা বচন দম্ভে কেউ কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, আমাদের সব ভাল, বলিয়া, কেউ কখনো উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা যথার্থ মাহাত্ম্যের জিনিস, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিলে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে মাহাত্ম্য জিনিসটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। যে কারণে সেই প্রাচীন মাহাত্ম্য ডুবিয়া গেল, তাহাও যত্নপূর্ব্বক বুঝিয়া লইতে পারিলে "সব-ভালোর" অন্ধতা চলিয়া যায়, এবং উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়। কবির গানের একটী ছত্রে এই দোষের কথার পরিস্ফুট আভাস আছে:—

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
হৃদয়ে তোর জাগায়ে তোল্ ভাবের প্রতি ভাবের টান্।

আমরা বড় ছিলাম, সেত ভাল কথা; কিন্তু এখন যে কত দিক দিয়া কত ছোট হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা ভাবিতে কুণ্ঠিত হই কেন? সত্যের ভিত্তিতে হউক, মিথ্যার ভিত্তিতে হউক, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই স্বদেশহিতৈষণা জাগিয়া উঠিবে, এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে, এ কথায় কোন সমাজ-তত্ত্ববিৎ বিশ্বাস করিতে পারেন না। ধর্ম্ম তত্ত্বের কথায়ও শুনিতে পাই (সেটা আমার মত লোকের শোনা কথা বই নয়) যে, পূর্ণমাত্রায় পাপ এবং অপরাধ বোধ না জন্মিলে কোন ব্যক্তি মুক্তি পথের প্রয়াসীও হইতে পারেনা। যাহা সর্ব্বত্র নিয়ম, তাহা কেবল স্বদেশ-হিতৈষণার বেলায় অনিয়ম, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

কবির 'রাণা প্রতাপ' নাটকের-নায়ক আদর্শ ক্ষত্রিয়, প্রতাপের শৌর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য্য ক্ষমা, স্বদেশভক্তি, এ সকল অতি অধিক, অতি গভীর। কিন্তু মেওয়ার পতনের যাহা মূল কারণ, যে বিষ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পরে সকল দেশ জর্জ্জরিত করিল, তাহাও যে প্রতাপ চরিত্রে নিহিত ছিল, কবি সুকৌশলে তাহা তাঁহার নাটকে দেখাইয়া গিয়াছেন। শক্তসিংহ প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত, যাহা শক্তের শৌর্য্যে এবং বুদ্ধিমত্তার আয়ত্ত হইতেছিল, তাহা প্রতাপের কাছে অমূল্য, স্বদেশের লাভের বিবেচনায় অমূল্য। তবুও প্রতাপ, শক্তসিংহকে পরিত্যাগ করিলেন, কেননা শক্তসিংহ মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ যখন বলিলেন, তিনি এতদিন বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তখন বুঝিতে পারা গেল যে, এ দেশের কপাল পুড়িয়াছে। কোথায় জাতির সর্ব্বব্যাপী স্বার্থ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বংশ-গৌরব! এত নিঃস্বার্থতা, এত ত্যাগ, এত মাহাত্ম্য, ঐ সঙ্কীর্ণতায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। যে বিষয়ে মেওয়ার পতনের দৃষ্টান্ত আজও পরিস্ফুট, তাহা দেখাইতেছি। আমাদের সঙ্কীর্ণতা এবং আত্মকলহ, কবিকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে; গীতে তিনি গভীর দুঃখে সকলকে

আহ্বান করিয়া বলিতেছেন :—

ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পর্‌কে নিয়ে আপন্ কর;

বিশ্ব তোর নিজেরি ঘর,—আবার তোরা মানুষ হ।

"মা সত্যবতী, মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল? তার পতন, যেদিন থেকে সে নিজের চোখ্ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে,—যেদিন থেকে সে ভাব্‌তে ভুলে গিয়াছে। যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে; কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার, অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম, আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখ্‌বার কেউ অবসর পায় না। মেওয়ার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে মা!"

মহাবৎ খাঁ মহৎ, মহাবৎ খাঁ বীর। সে জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে মুসলমান। একজনের যদি আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিল যে অমুক ধর্ম্ম সেবা না করিলে তাহার মুক্তি নাই, তখন সে তাহা করিতে পারিবে না কেন? ধর্ম্ম মতের বিষয় হইল যখন পরলোকের কথা লইয়া, তখন যে যাহা ভাল বুঝিল, তাহার অনুসরণ করিলে তোমার আমার ক্ষতি কি? ঈশ্বর বলিতে আমি যাহা বুঝি, দেব পূজার পদ্ধতি আমি যেটা মানিয়া থাকি, সেইটী যদি অপর ব্যক্তি না মানিয়া লয়, তবে সে দূর হইয়া চলিয়া যাইবে? যদি কোন লোক দেশ-প্রচলিত দেব-পূজা পরিত্যাগ করে, তখন, সগরসিংহ মহবৎকে যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেই কথাই বলিয়া থাকি। আমরা বলি,—তুমি কি দুপাতা পড়েই এত বড় শাস্ত্র অগ্রাহ্য কর? হিন্দু ধর্ম্মের মত সনাতন ধর্ম্ম আর আছে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলি কি একটা দম্ভ এবং অহঙ্কারের কথা মাত্র নয়? ধর্ম্ম কি দম্ভ এবং অহঙ্কার? আর না হয়, তোমার মতই পরম সত্য, এবং তুমিই অগাধ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে তোমার মতে মত দিবে, এবং তুমি যেমন করিয়া ভাব, তেমনি করিয়া ভাবিবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার তোমার জন্মিল কেন? মত বিরোধের জন্য মহাবৎকে যদি তাড়াইয়া দাও, তবে সে একটা আশ্রয় গ্রহণ করিবেই ত! মনে কর যে সে না বুঝিয়াই মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তার পাপ হইল কি? সে যদি হিন্দু হইতে চায়, তুমি তাহাকে হিন্দু করিয়া লইতে পার? যে শরীরে ক্ষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বৃদ্ধির পথ নাই, বিনাশই যে তাহার একমাত্র ভাগ্য, এ কথাগুলি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? যেখানে তাহার স্বাধীনতা নাই, সেখানে কি প্রতিভা ফুটিতে পারে? হায় স্বদেশ!

আমরা এত মূর্খ যে, একথাও দম্ভ করিয়া বলি যে, নানা ধর্ম্ম, নানা মতের স্রোত বহিয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহাতে হিন্দুয়ানি ছাড়ে নাই। সত্য সত্যই কি আমাদের সমাজ, ক্ষয়ের সেই শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন জড়তার কঠিন অবস্থায় কোন নূতন ভাব সংক্রামিত হতে পারে না, পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, এবং বিনাশই একমাত্র পরিণামে অবশিষ্ট থাকে? যাহারা মৃত আচারের কঙ্কালকেই পূজা করে, তাহারা মহাবৎকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলে; এবং ফোঁটা কাটিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিলে (এবং না

করিলেও) গজসিংহের মত মহাপাপিষ্ঠকে সমাজের একজন বলিয়া সন্তুষ্ট থাকে। স্বদেশবাসি, একবার কবির কথা শোন :—

শত্রু হয় হোক্ না,—যদি সেথায় পাস্ মহৎপ্রাণ
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্ তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ সে যে,—তাহাকে দূর করিয়া দে,
সবার বাড়া শত্রু সে। —আবার তোরা মানুষ হ।

মহাবাৎ খাঁ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম-স্থান মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন না। কিন্তু মেওয়ার পতনের পূর্ব্বাহ্ণে যেদিন সগরসিংহ উদার হিন্দু ধর্ম্মের চরম মাহাত্ম্য বর্ণনার পর, মহাবৎকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার হিন্দুপত্নী তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করে বলিয়া তিনি পিতার গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়াছেন, তখন তিনি মেওয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাবাৎ খাঁর প্রতিজ্ঞা যে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুমোদিত নয়, একথা তাঁহার হিন্দু পত্নী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া লজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবাৎ রক্তমাংসে গড়া মানুষ। রমণীর প্রতি অত কঠোর অবিচারের কথা শুনিলে নিঃসম্পর্কীয়েরও রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত বলিয়াই গোঁয়ার, তাহারা যে সকল অনাচার অত্যাচারের সৃষ্টি করে, তাহা অত্যন্ত গর্হিত, এবং পাপদুষ্ট। কিন্তু তাহারা যে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহার মূলে কি আমাদের বহুকাল সঞ্চিত বিদ্বেষ এবং পাপ নাই? হিন্দু মুসলমানের বিবাদে উভয়পক্ষই, যাহা পরম কল্যাণপ্রদ, তাহা পায়ে দলিতেছে। ভ্রাতৃবিরোধে কল্যাণীই একা পিশিয়া মরিল।

এই ভ্রাতৃবিরোধ রহিত করিতে গিয়া, কি করিয়া মানুষ হইতে হয়, তাহা মানসী রাণাকে বলিয়াছিলেন। মানুষ হইতে হয়, "বিদ্বেষ বর্জ্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে নিয়ে।" একি বড় আস্‌মানি রকমের কথা? বিশ্বপ্রেম বিকশিত হইলে কি স্বদেশ-প্রেমের প্রগাঢ়তা থাকিবে? ধর্ম্মের কথায়ও ঠিক এই রকম সন্দেহই উপস্থিত হয়। যদি সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে ভালবাসিতে যাই, তাহা হইলে আমার সাধের সংসারটী কোথায় পড়িয়া থাকিবে? সংসারকে ভালবাসিতে না পারিলে যে সংসারের পরপ্রান্তে জগদীশ্বরের চরণে আমাদের ভালবাসা পৌঁছায় না, এবং অন্যদিকে আবার তাঁহাকে পাইলেই যে সব পাওয়া যায়, এ সকল কথা আমরা ভোগাসক্তিতে বুঝিতে পারি না।

বিশ্বপ্রেম একটা লোকাতীত পদার্থ নয়। যে নিজের পরিবারকে ভালবাসিতে পারে না, স্বদেশকে ভালবাসিতে শিখে নাই, তাহার মনে বিশ্বপ্রেম জাগিবে কেমন করিয়া? জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতির অনুভূতিতে এখানেও এই কথা খাটে যে বিশ্বপ্রেম জন্মিলে স্বদেশপ্রীতি এবং আত্ম-প্রীতি বিশুদ্ধ হয়। যাঁহাদের অল্প মাত্রও বিশ্বপ্রীতি আছে, তাঁহারা আটলাণ্টিকের পরপারেরও দাসত্বপ্রথার অত্যাচার দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। যদি কোন প্রকারে নিজের দোষে কিম্বা পরের অত্যাচারে কোন জাতি মাথা তুলিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে, তবে কি সেই জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রেমিক, তিনিই সর্ব্বাগ্রে সে বাধা তিরোহিত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না? উদাসীন শ্রেণীর ফকিরি, ধর্ম্মক্ষেত্রেও মহাপাপ, সংসারক্ষেত্রেও মহাপাপ। পবিত্রতার অর্থ ফকিরি নয়; পবিত্রতা অনেকে মাজিয়া

উজ্জ্বল করে, ভক্তিকে সরস করে, এবং শক্তিকে সচল করে। কবি যথার্থই লিখিয়াছেনঃ—

জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পরে রাজায় চোখ,
পুণ্যসেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু তোর্।
ধর্ম্ম যথা, সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাব্, আবার তোরা মানুষ হ।

কবির মেওয়ার পতনের মূলমন্ত্রটী মানসীর ঐ গানে। সেইজন্য জাতীয় সাহিত্যের ঐ অমূল্য গানটীর কথায় অনেক কথা বলিতে হইল। ঈশ্বরকে মাথার উপরে আসন দিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, স্বদেশসেবা করিতে গেলে যদি পদে পদে বাধা পড়ে, তবে নিশ্চয় জানিও, তুমি পাপের কুহকে পড়িয়া অপূজ্যকে পূজা করিতে বসিয়াছ; স্বদেশের চরণপ্রান্তে তোমার পূজার অঞ্জলি পড়িতেছে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং নীচ সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া ফেলিয়া দাও; বিধাতার আশীর্ব্বাদে সুদিন আসিবে। আবার তোরা মানুষ হ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাজশাহী সাহিত্য সম্মিলন।

যাঁহারা সাহিত্য-সেবী, বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধনে সতত বদ্ধপরিকর, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কোনও স্থানে একত্র সম্মিলিত হন,ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাতে সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় হইবার একটা সুযোগ ঘটে, এবং যাঁহারা সাহিত্যের বড় একটা ধার ধারেন না, তাঁহারা সাহিত্য-সেবিগণের সংসর্গে আসিয়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ-পরায়ণ হইতে পারেন। অতএব যাঁহারা এই সম্মিলনের উদ্ভাবক, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের পরম উপকারী, সন্দেহ নাই।

সর্ব্ব প্রথম ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বরিশাল নগরীতে এই সম্মিলনের কথা ছিল। সাহিত্য-মহারথী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মিলনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া সেই স্থানে গিয়াও ছিলেন—আরও বহু সাহিত্য-সেবী সম্মিলনে যোগ দিবার নিমিত্ত বরিশালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। হঠাৎ কোনও কারণে—এবং তাহা সকলেই জানেন—সম্মিলনে বাধা পড়িল; তদর্থে উপস্থিত সকলেই ভগ্নমনোরথে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সুতরাং বলিতে হইবে, এক অশুভ মুহূর্ত্তেই, বোধ হয়, এই শুভকর সম্মিলনের কল্পনা হইয়াছিল। দ্বিতীয় উদ্যমেও ইহারই প্রমাণ পাইলাম। কাশিমবাজারের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের উদ্‌যোগে মোরশিদাবাদে সম্মিলন সংঘটিত হইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে, এমন সময় মহারাজ বাহাদুরের উপর এক আকস্মিক বিপৎপাত হইল, সেইবারও সম্মিলনে বাধা পড়িল।

তৎপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের দীপান্বিতার পুণ্য-তিথিতে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিনায়কত্বে এবং প্রাগুক্ত মহারাজ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত হইল।

প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রথম সম্মিলনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই, দ্বিতীয় সম্মিলনে, যেরূপেই হউক, উপস্থিত হইব, এই সংকল্প করিলাম।

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এই বৎসর শ্রীপঞ্চমী যোগে রাজ-

শাহীতে সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। সরস্বতী পূজার সপ্তাহ খানিক পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ দুইটী নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম; প্রথমতঃ বগুড়া উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তারিখ ১৮ই ও ১৯শে মাঘ; দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের, তারিখ ১৬ই ও ১৭ই মাঘ। এত কাছাকাছি দুইটী সম্মিলন, তাহাও একই বিভাগের দুইটী পরস্পর পাশাপাশি জেলায়, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বগুড়ার নিমন্ত্রণটী "উত্তর বঙ্গ" সম্পর্কীয়, আমার সঙ্গে বঙ্গের এই ভাগের সম্পর্কই বা কি? অথচ উভয় সম্মিলনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত আবশ্যক পরিমাণে ছুটিও পাইব না ভাবিয়া, এই নিমন্ত্রণ ধন্যবাদ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজশাহীতে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাত্রা করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় এক খানি কার্ড পাইয়া জানিলাম, রাজশাহীর সম্মিলনের তারিখ দুই দিন পিছাইয়া ১৮ই ও ১৯শে মাঘ অর্থাৎ বগুড়ার সম্মিলনের একই তারিখে পড়িল। যাত্রা ভঙ্গ হইল, মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভও হইল। হায় বাঙ্গালী, বিনা ভণ্ডুলে তোমার কি কোনও কাজই হয় না?

যাহা হউক যথাকালে পুনশ্চ যাত্রা করিয়া ১৬ই মাঘ, শুক্রবার, শেষ রাত্রে (প্রায় ৪ টার সময়) নাটোর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। রাজশাহী-প্রবাসী জনৈক বন্ধুকে ইতিপূর্ব্বে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নাটোর ষ্টেশনে সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের হইয়া আগন্তুকবর্গের তত্ত্বাবধানার্থ কোনও স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে কি না, ইহার উত্তরে বন্ধুবর লিখিয়াছিলেন, "অবশ্যই থাকিবে।" ষ্টেশনে নামিয়া কিন্তু সেইরূপ কিছুই দেখা গেল না। যাহা-হউক, ২।৪ মিনিটের চেষ্টার পর একটী সহযাত্রীর সাহায্যে কুলির যোগাড় হইল, এবং তৎসহায়তায় "কেবিইং কোম্পানির" শকট-আফিসে গিয়া জানিলাম, তাঁহাদের সমস্ত গাড়ী গুলিই "রিজার্ভ" হইয়া গিয়াছে—কেননা কলিকাতা হইতে প্রেসিডেণ্ট ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রমুখ অনেক ভদ্রলোক দার্জ্জিলিঙ্ আপ্ মেলে আসিয়া ষ্টেশনগৃহে শুইয়া আছেন, তাঁহারা রাত্রি প্রভাতে রাজশাহী যাইবেন। তখন অন্য কোম্পানির (বি,সি (?)) গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল, কিন্তু কেবিইং-কোম্পানির আফিসে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ইত্যবসরে কলিকাতা হইতে আগত দুই জন তরুণ বয়স্ক ভদ্রলোক কোম্পানির কেরাণীবাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন "মহাশয়, নাটোরের মহারাজের বাড়ীটা কতদূর? ডাঃ রায় চা না খাইলে নড়িতেই পারিবেন না,* দুধ চাই, ওখানে দুধ পাওয়া যাইবে কি?" ইত্যাদি। তখন রাত্রি পৌনে পাঁচটা আন্দাজ। নানা কারণে মনে কষ্ট হইল। ডাঃ রায় অবশ্য উপযাচক হইয়া সভাপতির কার্য্য করিতে আসেন নাই—রাত্রি ১০টার সময় নাটোর আসিয়া কিনা শুইবার জন্য তাঁহাকে সদলবলে ষ্টেশন-গৃহের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল! কেবল কি সম্মিলনের সভাপতিরূপেই

* ধন্য চা! যে মহাত্মাকে সংসারশৃঙ্খল আবদ্ধ করে নাই, তুমি তাঁহার উপর—নারায়ণের উপর যোগ নিদ্রার ন্যায়—কি বিষম চাপিয়াছ। ইহাতে স্বতঃই চক্ষু প্রাচীন আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপকেরা ২।১ দিন জলগ্রহণ না করিয়াও কেমন স্বচ্ছন্দে ও প্রফুল্লচিত্তে দূরদেশস্থিত নিমন্ত্রণকারীর গৃহে উপস্থিত হন, অনেকেই, বোধ হয়, সেইদৃশ্য দেখিয়াছেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পাত্র ? যাঁহার নাম লইয়া আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরব করিতেছে, নাটোরে তাঁহার অভ্যর্থনার একটুও ব্যবস্থা হইল না। তিনি যে সদলে আসিতেছেন, এ কথা অবশ্যই পূর্ব্বে জানিয়াছিল, নচেৎ গাড়ীগুলি রিজার্ভ হইল কিরূপে ? ইঁহাদের যখন এই অবস্থা, তখন আমার মত নগণ্যের জন্য যে নাটোরে কোন ব্যবস্থা থাকিবে, ইহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত, বিশেষতঃ আমি যে কোন্ মুহূর্ত্তে নাটোরে পৌঁছিব, ইহা পূর্ব্বে জানাইও নাই।

আমরা বি, সি, কোম্পানির গাড়ীতে প্রায় ৫ ঘণ্টায় নাটোর হইতে রাজসাহী পৌঁছিয়া দেখি, বিশাল মণ্ডপ সজ্জিত হইতেছে। মণ্ডপের পার্শ্বস্থ একটী দালানে অভ্যাগতগণের—উঁহারা বলেন "ডেলিগেট্"-দের (কিসের "ডেলিগেট্?")—স্থান হইয়াছিল। সম্মিলনের বৈঠকের কাল দুই দিবস পিছাইলেও, কাজ কর্ম্মের যে তখনও সুব্যবস্থা হইয়াছিল, সেরূপ ভাব দেখিলাম না। পর দিন প্রাতেই সম্মিলন-সভা বসিবার কথা, সেইজন্য সারা রাত্রি খাটিয়া উদ্যোক্তৃবর্গ কোনও রূপে মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও সজ্জার কাজ সারিয়া লইয়াছিলেন।

"রাজশাহী ও বঙ্গসাহিত্য" এই দুইটী সমকালে উচ্চারিত হইবামাত্র যাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়, সেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় রাজশাহী ছাড়িয়া নাকি শুক্রবারই বগুড়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি ভিতরকার খবর জানিনা, জানিতে চেষ্টাও করি নাই। কলহ, মনান্তর বা দলাদলির কথা জানিবার বা শুনিবার জন্যও রাজশাহী যাই নাই। বাঙ্গালীর বীজ যেখানে পড়িয়াছে, সেই খানেই ত ইহা বর্ত্তমান।

যাহা হউক, আমার মন কাণ্ডকারখানাটা দেখিয়া বড় দমিয়া পড়িল। এত পথ-ক্লেশ, অর্থব্যয়, আরও নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া রাজশাহীতে গিয়াছিলাম—বগুড়ার জন্য সভায় যে অনেকে অনুপস্থিত হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই ভাবিয়া আসিয়াছিলাম—কিন্তু ক্ষুদ্র রাজশাহীতেই যে দুইটা দল থাকিবে, ইহাত ভাবি নাই। কলিকাতা হইতে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি আসিয়াছিলেন—অনেকে বোধ হয় বিরোধের আঁচ পাইয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনে আগমনার্থ পা বাড়ান নাই। আমারই অদৃষ্ট মন্দ।

সভাপতি ডাঃ রায়ের দল প্রায় ১॥ টার সময় রাজশাহীতে পৌছেন। ডাঃ রায় এবং অপর একজন বিলাত ফেরত মিঃ—*, একখানি বজ্‌রা নৌকায় পদ্মাবক্ষে বাসা পাইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য মণ্ডপের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দালানে ঢালাও বিছানা হইল। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইল, ভাবিলাম, যা'হউক, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গেত অহোরাত্র একত্র থাকিয়া নানা প্রসঙ্গে বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ও বিধি! সেই সাধেও তুষার বাদী হইলে, সাহিত্যরথী অমুক সাহিত্যসারথি অমুকের আবাসস্থলে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অস্মাদৃশ পদাতিদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন! আবার এই "পদাতিক" দলেরও কাহাকেই সেই পূর্ব্বোক্ত ঢালাও বিছানায় থাকিতে দেখিলাম না; এই অধমই মাত্র একাকী সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষদ্বয়ের এক ঘরের এককোণে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। "একাকী" বলিলে একটু দোষ হয়; কেন না, পর দিন ভোরে

* খোকার গেলে যেমন হাজি হয়; তদ্রূপ বিলাতে পা দিলেই অনেকেরা "মিঃ" হইয়া পড়েন।

ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, সেই বিছানায় দুই একটী ভৃত্য ইতস্ততঃ শয়ান রহিয়াছে।

শনিবারের কথা এখনও শেষ হয় নাই। যখন শুনিলাম, কলিকাতার সাহিত্যক দল অর্থাৎ সভাপতি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সাহিত্য-পরিষদ সম্পাদক-সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি পৌঁছিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ার্থে সেই পদ্মাবক্ষঃস্থিত বজরায় চলিয়া গেলাম। তাঁহারা সকলেই বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন অমায়িক প্রকৃতিক, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আবার সময় লাগিল না। বিশেষতঃ বঙ্গ-জননার গৌরবের ধন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের অবর্ণনীয় সরল ও নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া প্রকৃতই মুগ্ধ হইলাম। যে সকল শফরী গণ্ডূষ জলমাত্রে ফর্ ফর্ করেন, তাঁহারা যেন একবার এই অগাধ জলসঞ্চারী নির্ব্বিকার রোহিতটী দেখিয়া যান্।

সেই দিন আর একটী বস্তু দেখিয়াছি। রাত্রে দিঘাপাতিয়ারাজের বাসা বাড়ীতে বিষয় নির্ব্বাচন নিমিত্ত একটী বৈঠক হইয়াছিল। সেইখানে গিয়া দেখি, সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্র বেষ্টিত শশধরের ন্যায়, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তুলসীমালা শোভিত-কণ্ঠ সৌম্যমূর্ত্তি মহারাজকে দেখিলেই জ্ঞান হয় যেন, মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য রাজবেশে মর্ত্যভূমে অধিষ্ঠিত। সকলে তাঁহার সাহিত্যে আসক্তি ও বিদ্বদ্বর্গের প্রতি অনুরক্তি দেখিয়া, তাঁহাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরসাপত্ন্য ভাবের অভাব অবলোকনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মিত হই নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতী অন্যত্র পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভে পরাঙ্মুখী হইতে পারেন; কিন্তু নারায়ণে উভয়েই সতীজনোচিত অনুরক্তা। মহারাজের হৃদয়ে সতত নারায়ণ বিরাজমান, লক্ষ্মী সরস্বতী সুতরাং এই আধারে সমভাবে উভয়েই অনুরাগিণী হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ১০টা পর্য্যন্ত কাজ হইয়া সভ্যগণের স্নানাহার নিমিত্ত সভাভঙ্গ হইল। এই বেলা কেবল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায় তদীয় "সম্ভাষণ" এবং সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় "অভিভাষণ" পাঠ করিয়াছিলেন। উভয় প্রবন্ধই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কেবল ডাঃ রায়ের প্রবন্ধের একস্থলে যে ঋষিকল্প রঘুনন্দনের এবং বঙ্গ গৌরব রঘুনাথ-প্রমুখ নৈয়ায়িকবর্গের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, ইহা প্রাণে বড় বাজিল। বিশেষতঃ সরস্বতীর এমন নিষ্কপট সাধক সংযমশীল ডাঃ রায়ের দ্বারা তাঁহাদের প্রতি ঈষৎ অনাদরের ভাব প্রদর্শন বড়ই অপ্রত্যাশিত—ইহা চাপিয়া গেলে প্রবন্ধেরও কোন অঙ্গ হানি হইত না।*

অপরাহ্নে প্রায় ৩টার সময় পুনঃ কার্য্যারম্ভ হয় এবং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই সেই দিনের জন্য সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়। এইবেলা সম্মিলন উপলক্ষে নানা বিষয়ক নির্দ্ধারণের প্রস্তাব ও সমর্থন হইয়াছিল। এতন্মধ্যে একতমের সমর্থন করিতে গিয়া রাজশাহীর লোকপ্রিয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত

* সেই দিন সন্ধ্যার পর আমি সবিনয়ে ডাঃ রায়ের নিকট আমার এই কথাটী প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু উদার ডাঃ রায় ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন নাই।

আবদুল মজিদ সাহেব বঙ্গভাষায় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিয়া, ভাবের ঔদার্য্যে ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে শ্রোতৃবর্গের অকপট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসামীয় মোসলমান, অথচ তাঁহার বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রতি ঈদৃশ সুগভীর সহানুভূতি বাস্তবিক বড়ই আনন্দের বিষয়। সম্মিলনের উপলক্ষে যে সকল রচনা পাঠ হইবার কথা ছিল, ঐদিন তাহার একটীমাত্র পঠিত হইয়াছিল, এই রচনা পাঠক ছিলেন, রাজশাহী কলেজের আরব্য-পারস্যবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আবদুল মোয়াইদ খাঁ। বিষয় "বঙ্গীয় মুসলমানগণের ভাষা।" কি বিষয় সন্নিবেশে, কি লিপিকৌশলে, কি যুক্তির অবতারণায়, কি পড়িবার প্রণালীতে, সর্ব্ব বিষয়ে এইটী অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায় প্রতি বাক্যের অবসানে তুমুল করতল-সংঘর্ষ-নির্ঘোষদ্বারা প্রবন্ধের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। পাঠান্তে রচয়িতা আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে, স্বয়ং সভাপতি দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। ইতঃপর সেইদিন অন্য কোনও রচনা পড়া হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই দিনকার কার্য্যের এইরূপে মধুরেণ সমাপন হইল।

রাত্রিতে সাধারণ পুস্তকালয়ে অভ্যাগতদিগের বিনোদনের নিমিত্ত আয়োজন অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গান, বাদ্য, আবৃত্তি, ছায়াবাজি, জলযোগ প্রভৃতি কোন অঙ্গেরই ত্রুটি ছিল না। রসিক কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের হাসির গান গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

সোমবার অধিবেশনের দ্বিতীয় এবং শেষ দিন। প্রবন্ধ অনেকগুলি ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইলেও, পঠিতব্য রচনার সংখ্যা ১০।১২টীর কম ছিল না। ৮টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইলেও এবং রচনা পাঠের সময় ১৫ মিনিট নির্দ্ধারিত হইলেও, এই দিনের কাজ শেষ হইতে প্রায় ২টা বাজিয়াছিল। সভাপতি মহাশয়কে এবং এই সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয়ের এবং তৎপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট মহারাজ বাহাদুর-প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির ফটো তোলা হইল। চিত্রে সামিল হইবার নিমিত্ত যাঁহাদের আগ্রহাতিশয় ছিল, তাঁহারা সারি বাঁধিয়া সভাপতির পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন।

ঐ দিনই প্রায় ৪টার সময় কেরিইং কোম্পানীর ডাকবাহী অশ্বশকটে রাজশাহী পরিত্যাগ করিলাম। যে কয়দিন রাজশাহীতে ছিলাম, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শশধর রায় প্রভৃতি উদারাশয় মহাত্মাগণের আদর আপ্যায়নে কোনও রূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ক্ষুদ্র হইলেও আমার প্রতি তাঁহাদের সদয় ব্যবহার দর্শনে কালিদাসের সেই কবিতাংশটী মনে পড়িয়াছিল :—

"ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং অতীব।"

এই সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিবর্ষেই যখন হইবে, তখন ইহা কিরূপ ভাবে হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার অবতারণা করা অতীব প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি।

ইহা সাহিত্য-সম্মিলন, অর্থাৎ সাহিত্য-সেবিগণের একত্র মিলনস্থল, সুতরাং ইহা কলিকাতাস্থ সম্মিলনের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের একটী বড় মজলিস্। ইহার অপেক্ষা বেশী একটা কিছু যদি কেহ মনে করেন, করিতে পারেন। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রমতি, ইহার

অধিক মনে করিতে চাই না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য সাহিত্য-পরিষদ, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি আছেন পরিষদের শাখাও নানা স্থানে হইয়াছে এবং হইবে। "সম্মিলন" দুই দিনের জন্য বসিয়া ঐ সকল সভার হাত হইতে উহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি কাড়িয়া লইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি রিজলিউশন্ পাস্ করিবেন, এইটা আমি ভাল মনে করি না। আমরা বাইবেলের গড নহি যে, "অমুকটি হউক" বলিলাম, আর অমনি তাহা হইয়া গেল। এই যে প্রায় দেড় বৎসর হইল, সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে একরাশি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, এ যাবৎ কয়টী কাজ হইয়াছে?

তবে সম্মিলনে কি হইবে? কেন, সম্মিলনে বহুকাজ হইবে। সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির স্থান কলিকাতায়, সুদূর মফঃস্বলবাসীরা তাহার একটা খবর শুনে বটে, কিন্তু তাহার কিছু দেখে না। সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে যাঁহারা দূরদৃষ্টবশতঃ মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহারা কেন্দ্রভূমিস্থ কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ভাব-বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হইলেও সুযোগ পান না। সম্মিলন সেই সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। কিয়দ্দিনের জন্য মুরশিদাবাদে বা রাজশাহীতে, পাবনায় বা ভাগলপুরে সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগীদের সমাগমে সে উদ্দীপনা হইবে, ইহাই সাহিত্যের পরম লাভ। এই সকল সম্মিলনে বরং এই করা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক সাহিত্যিক সভা—পরিষদ ও তদীয় শাখাবলী, সাহিত্য সভা, ইত্যাদি—সংবৎসর কাল কি কি কাজ করিলেন, তাহার একটী বিবরণী পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে দুইটী ফল হইবে; কোনও সভায় যদি বিশেষ কাজ না হইয়া থাকে, তবে লজ্জা পাইতে হইবে ভাবিয়াও ভবিষ্যতে কাজের দিকে প্রয়াস হইবে; দ্বিতীয়তঃ মফঃস্বলের লোকেরাও অবগত হইবেন যে, সভাগুলির দ্বারা এই এই কাজ হইতেছে,—অতএব তাঁহাদের ঐ সকল কাজে প্রবৃত্তি জন্মিবে।

অতএব কোনও প্রস্তাব করা এই সম্মিলনের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করাই উচিত। সম্মিলনের উদ্‌যোক্তৃগণ যে সকল সাহিত্য-সেবক বা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তাঁহাদের সংবর্দ্ধনার্থ সম্ভাষণ-পত্রপাঠ করিতে পারেন। সভাপতি নিয়োগ পূর্ব্বাবধি করিয়া প্রয়োজন নাই—দরকার মনে হইলে, একজন সভাধিনায়ক উপস্থিত সাহিত্য-সেবকগণ হইতে মনোনীত হইতে পারেন। প্রথম দিন সমাগত নিমন্ত্রিত সাহিত্য-সেবকদিগকে উদ্‌যোক্তৃগণের মধ্যে কেহ সমবেত সাধারণ জনতার নিকট পরিচিত করিয়া দিবেন; তৎকালে তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্যের কিরূপ সেবা হইতেছে, বলিয়া দিবেন। প্রথমতঃ এইরূপ অভ্যর্থনাদি হইবে। তারপর প্রত্যেক সাহিত্যসভার কার্য্যসম্বন্ধে তত্তৎসভার প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করিবেন। অতঃপর উপস্থিত সাহিত্য-সেবকগণের কেহ যদি সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বা রচনা পাঠ করিতে চাহেন, তাহা করিবেন। অধিকন্তু তাঁহাদের আমোদের নিমিত্ত নানা প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে।

নানা সাহিত্য সভা হইতে আগত প্রতিনিধিগণ কেবল যে বক্তৃতা ও রিপোর্ট পাঠ করিবেন, এমন নহে, প্রদর্শনীয় কোনও কিছু যদি উপস্থাপিতও করিতে পারেন।

যাঁহারা রচনা পাঠ বা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বদিনে তাহা সম্মিলনের উদ্‌যোক্তাদিগকে জানাইবেন। সংক্ষেপে বিষয়টীর বিবরণীও দিবেন। প্রবন্ধ ভাষা বা সাহিত্য বিষয়ক হওয়া চাই। বিগত সম্মিলনে পঠিত "উদ্ভিদের আহার," "পরমাণু-তত্ত্ব," "রঞ্জন শিল্প" "স্বয়ং-বহযন্ত্র" ইত্যাদি প্রবন্ধ অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। তাহা হইলে, ইহার সাহিত্য সম্মিলন" নাম না হইয়া "সারস্বত-সম্মিলন" অথবা ইত্যাকার অন্ত কোনও নাম হওয়া উচিত।

স্বীকার করি, সাহিত্যের পুষ্টি বা উন্নতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা তেমনই হয়, যেমন গল্প, নাটক বা কবিতা পুস্তকের দ্বারা হয়। এই হেতুতে সাহিত্য-সম্মিলনে "খালাস্" এর ন্যায় গল্পের বা "চিত্র দর্শন" এর ন্যায় কবিতা পড়িতে হইলে, কিম্বা "চৈতন্যলীলার" ন্যায় নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে কেমন হইবে? ফলতঃ যাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইবে, ইহার দোষবর্জ্জন বা গুণার্জ্জন কল্পে কি কি বিধেয়, ইহার অনুশীলন, প্রসার প্রভৃতি কিরূপে বর্দ্ধিত করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ই সাহিত্য-সেবিগণের সমক্ষে আলোচিত হওয়া উচিত।* ইহাতে সকলেই অল্প স্বল্প শিক্ষালাভ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালা স্বকুমার সাহিত্য"সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী সম্মিলনের বেশ উপযোগী হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি সভাপতি মহাশয় অতিরিক্ত সময়দানে করুণা প্রদর্শন করেন নাই, অথচ রঞ্জন-শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধে অত্যধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।† বেগতিক দেখিয়া বোধ হয় সুলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'সমালোচনা' বিষয়ক সম্মিলনের উপযোগী অপর একটী প্রবন্ধ শিরঃপীড়া ব্যপদেশে সভায় পাঠ করিতে সম্মত হন নাই।

সম্মিলন যে স্থানে হইবে, সেই স্থানের স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে স্বেচ্ছা সেবক ভাবে সাহিত্যসেবীদের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করা উচিত। ইহাতে তাহারা সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইবে। ইহাতে সাহিত্যপরায়ণ হইবার জন্য স্পৃহাও তাহাদের কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে। রাজশাহীতে যদিও কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অধ্যাপক ও শিক্ষক মহাশয়দের অনেকেই সম্মিলনে সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন, তথাপি ছাত্রদিগকে সম্মিলনের কোনও কাজে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল শেষের দিন দেখিলাম, কয়েকটী ছাত্র কিছু কিছু কাজ করিয়াছিল। সেই দিন সেখানে অভ্যাগতদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পাত পাড়িতেও দেখিয়াছিলাম।

যাঁহারা অকৃত্রিম সাহিত্য সেবক, অথচ অর্থাভাবে সাহিত্য সম্মিলনে যোগ-দান করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের যাতায়াতের ব্যয়-

---

* বস্তুতঃ "সাহিত্য" অর্থে আজকাল কে কি বুঝেন, জানি না। সেদিন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। হাভেল সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, আমি ক্ষুদ্র-মতি ত বুঝিলাম না।

† উদারমতি ডাঃ রায় এই বিষয়ে স্বয়ং বেশ চতুরতা সহকারে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট পরিহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তারও সম্মিলনের উদ্‌যোক্তৃগণের বহন করা উচিত। তবে এইরূপ অর্থ সাহায্য, দরিদ্র হইলেও, অভিমানে কোন সাহিত্যিক প্রকাশ্যে গ্রহণ করিবেন কিনা, সন্দেহ।

আর যাহাতে যুগপৎ দুইটী স্থানে সাহিত্যিক সম্মিলন না হয়, সর্ব্বাগ্রে ইহার বিধান বা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলনের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সম্মিলনের পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ ইহা অবধান-যোগ্য মনে করিবেন কিনা, জানি না। যদি কিয়ৎপরিমাণেও করেন, তবে এই সম্মিলনে যোগদানার্থ যে আয়াস করা হইয়াছে, তাহা প্রভূত পরিমাণে সফল হইয়াছে, মনে করিয়া, আত্মপ্রসাদ অনুভব করিব।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

গীতার ঐতিহাসিকতা।

[ঝ] গীতা প্রণয়নের সময়ের আভ্যন্তরিক প্রমাণ।

আমরা পূর্ব্বে বাহিক প্রমাণ সকলের উপর নির্ভর করিয়া গীতার সময় নিদ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে গীতার আভ্যন্তরিক প্রমাণের আলোচনা করা যাইতেছে। থিওসফিষ্ট (Theosophist) নামক পত্রিকায়, ১৯০৮ সালে মার্চ্চ, এপ্রিল ও মে মাসে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমাপ্রসাদ নিম্নোক্ত প্রকারে দুই একটা আভ্যন্তরিক প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে নিজের বিভূতি বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে,—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" (১০।৩৫), দ্বাদশ মাসের ভিতর আমি মার্গশীর্ষ। মার্গশীর্ষের অপর নাম অগ্রহায়ণ। বৎসরের প্রথম মাসকেই অগ্রহায়ণ বলা হয়। মুখ্য মাস বলিয়া ইহাকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে। পণ্ডিত দৈবজ্ঞ সূর্য্য 'পরমার্থ প্রপা' নামক গীতার টীকাতে লিখিয়াছেন যে, মৃগশিরা-নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী হওয়াতে এই মাসকে মার্গশীর্ষ বলা হইয়াছে। মৃগশিরার দেবতা হইতেছেন চন্দ্র। এবং যে নক্ষত্র হইতে যে মাসের নাম হয়, সেই নক্ষত্রের যিনি দেবতা, তিনিই সেই মাসের দেবতা হন। সুতরাং মার্গশীর্ষের চন্দ্রই দেবতা। এবং তিনি পূর্ণিমারও দেবতা। মাসের দেবতা, নক্ষত্রের দেবতা এবং পূর্ণিমার দেবতা এক বলিয়া এই মাসের পূর্ণিমা অতি পবিত্র। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, এই মাস আমার বিভূতি।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, কোন্ সময়ে মার্গশীর্ষকে অগ্রহায়ণ বা বৎসরের প্রথম মাস বলা হইত? সেই সময় নিদ্ধারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের এবং গীতারও সময় নির্দ্ধারিত হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিয়াছিলেন যে, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, তখন মার্গশীর্ষ বৎসরের মধ্যে প্রথম বা মুখ্য মাস বলিয়া পরিগণিত হইত।

জ্যোতিষে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাসন্তিক ক্রান্তিপাত যখন যে নক্ষত্রে হয়, সেই নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসীকে বৎসরের

প্রথম মাস বলা হয়। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত যখন মৃগশিরায় হইত, তখন মার্গশীর্ষকে মুখ্য মাস ধরা হইত। বাসন্তিক ক্রান্তি-বিন্দু ভানের (ecliptic) সর্ব্বোচ্চ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য অথবা চন্দ্র যখন এই বিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্র উক্ত নক্ষত্রের, মাসের এবং পূর্ণিমার দেবতা বলিয়া এবং এই সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত বলিয়া, বৎসরের মধ্যে চন্দ্রের ক্ষমতার প্রকাশ এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত। এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ।

জ্যোতিষের মতে ২৭ নক্ষত্র বার রাশি ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ এক এক রাশি ২¼ নক্ষত্র ভোগ করিয়া থাকে। ২৭ নক্ষত্র ৩৬০ ডিগ্রি ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং এক এক নক্ষত্র ১৩°—২০' মিনিট ভোগ করিয়া থাকে। যেমন—

মাস	নক্ষত্র	ডিগ্রি	রাশি
	অশ্বিনি	১৩-২০	
আশ্বিন	ভরণী	১৩ ২০	মেষ
	কৃত্তিকা ¼	৩-২০	
	কৃত্তিকা ¾	১০-০	
কার্ত্তিক	রোহিণী	১৩-২০	বৃষ
	মৃগশিরা ½	৬-৪০	
	মৃগশিরা ½	৬ ৪০	
মার্গশীর্ষ	আর্দ্রা	১৩-২০	মিথুন
	পুনর্ব্বসু ¾	১০-০	
	পুনর্ব্বসু ¼	৩-২০	
পৌষ	পুষ্যা	১৩-২০	কর্কট
	অশ্লেষা	১৩ ২০	
	মঘা	১৩-২০	
মাঘ	পূর্ব্ব ফাল্গুনি	১৩-২০	সিংহ
	উত্তর ফাল্গুন ¼	৩ ২০	
	উত্তর ফাল্গুনি ¾	১০-০	
ফাল্গুন	হস্তা	১৩-২০	কন্যা
	চিত্রা ½	৬-৪০	
	চিত্রা ½	৬-৪০	
চৈত্র	স্বাতি	১৩-২০	তুলা
	বিশাখা ¾	১০-০	
	বিশাখা ¼	৩-২০	
বৈশাখ	অনুরাধা	১৩-২০	বৃশ্চিক
	জ্যেষ্ঠা	১৩-২০	
	মূলা	১৩-২০	
জ্যৈষ্ঠ	পূর্ব্বাষাঢ়া	১৩-২০	ধনু
	উত্তরাষাঢ়া ¼	৩-২০	
	উত্তরাষাঢ়া ¾	১০-০	
আষাঢ়	শ্রবণা	১৩-২০	মকর
	ধনিষ্ঠা ½	৬ ৪০	
	ধনিষ্ঠা ½	৬-৪০	
শ্রাবণ	শতভিষা	১৩-২০	কুম্ভ
	পূর্ব্বভাদ্র পদ ¾	১০-০	
	পূর্ব্বভাদ্র পদ ¼	৩ ২০	
ভাদ্র	উত্তর ভাদ্রপদ	১৩-২০	মীন
	রেবতি	১৩-২০	

যে নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে মাসের নাম হইয়াছে।*

* It is found that the full-moon day either begins or ends in one of these mansions in the appropriate months. The other asterisms do not give names to the months, although it is seen that the full-moon day begins and ends sometimes in other months also. Thus at a time when the moon becomes full in the beginning of the constellation of Aswini the fullmoon day must have begun in the constellation of Revati, but the month is not calledafter Revati. And this happens in the case of every month. The reason for this is that

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইতেছে যে, বৃষের ২৩২০ মিনিট গত হইলে মৃগশিরা আরম্ভ হইয়াছে এবং মিথুনের ৬-৪০ গত হইলে শেষ হইয়াছে। আজকাল বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মীনের ৭ ডিগ্রিতে হইয়া থাকে। সুতরাং বৃষের ২৩-২০ মিনিট হইতে মীনের ৭ ডিঃ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে (২৩-২০+৩০+২৩) =৭৬°২০ মিঃ পাওয়া যায় এবং মিথুনের ৬ ৪০ মিনিট হইতে মীনের ৭° পর্য্যন্ত হিসাব করিলে (৬-৬০+৬-৪০+২৩-২০+৩০+২৩) = ৮৯° ৪০ মিঃ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যগণ অঙ্ক পাতের দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ২৫৭৯১ বৎসরে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসে, সুতরাং ৭৬-২০ মিনিট এবং ৮৯ ৪০ মিনিট ঘুরিতে যথাক্রমে ৫৪৬৮ এবং ৬৪২৩ বৎসর লাগে। সুতরাং ৫৪৬৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৬৪২৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মার্গশীর্ষকে অগ্রহায়ণ বা বৎসরের প্রথম মাস বলা হইত। পণ্ডিত রমাপ্রসাদ বলেন যে, এই সময়ের ভিতর শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং গীতোক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৫১৫ বৎসর হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬০ বৎসরের মধ্যে গীতার সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেও ভগবদ্গীতার সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্ব্বের অন্তর্গত ১৭শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"মঘা বিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" অর্থাৎ যে দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই দিনে চন্দ্র মঘার দেশে গিয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা কালে নীলকণ্ঠ নিম্নোক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। "মঘা পিত্র্যং নক্ষত্রং তস্য বিষয়ো-দেশঃ পিতৃলোকস্তদ্গতঃ সোমঃ,"— অর্থাৎ মঘাকে পিতৃ নক্ষত্র বলা হয়, মঘার দেশকে পিতৃলোক বলা হয়। চন্দ্র যখন পিতৃ লোকে গিয়াছিলেন, তখন কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ ভারত সাবিত্রি নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥"

অর্থাৎ হেমন্তকালের প্রথম মাসে শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীতে এবং যে নক্ষত্রের দেবতা হইতেছেন যম, সেই নক্ষত্রের ভোগকালে মহাভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, "প্রথমে মার্গশীর্ষে। অত্র ত্রয়োদশী শব্দেন তদ্যুক্তা চতুর্দ্দশ্যেব গ্রাহ্যা,—প্রথম মাস অর্থে মার্গশীর্ষকে এবং ত্রয়োদশী শব্দ দ্বারা তদ্যুক্ত চতুর্দ্দশীকে বুঝাইতেছে। পুনশ্চ,—

"অর্জ্জুনেন হতোভীষ্মো মাঘ মাস্যসিতাষ্টমি।
ত্রয়োদশ্যাং তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ॥"

মাঘ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে ভীষ্ম অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হত হন এবং ত্রয়োদশীর মধ্যাহ্নে দ্রোণ নিহত হন। কিন্তু মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম এবং পঞ্চদশ দিনে দ্রোণ পতিত হন। সুতরাং ১৩র পরিবর্ত্তে ১৪তে, ১০ ও ১৫ যোগ করিলে যথাক্রমে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী

the months had been named originally on the rough principle of the full moon taking place in these asterisms, before deeper calculations and observations showed that the full moon day really began sometimes in other constellations also besides those which had been selected to name the *months*—The Theosophist, March, 1908

এবং ত্রয়োদশী পাওয়া যায়। "অত্র পৌষেঽপি মাঘশব্দো নববায়ণাভি প্রায়েণ তদানীং তৎ সত্বাৎ অসিতাষ্টমীতি চ্ছেদঃ।" এখানে মাঘ শব্দ দ্বারা পৌষকে বুঝাইতেছে। কারণ এই সময়ে অয়ণ অর্থাৎ হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত মকারে হইত। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ ধরিলে ভীষ্ম এবং দ্রোণের পতন যথাক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী এবং দ্বাদশীর দিন ঘটিয়া থাকে। পুনশ্চ দুর্য্যোধনের মৃত্যু অমাবস্যায় হইয়াছে বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলেন যে, এখানে অমাবস্যা অর্থে তাহার পরদিন প্রতিপদকেই বুঝিতে হইবে।

যে নক্ষত্রের অধিপতি যম, সেই নক্ষত্র মৃগশিরাকেই বুঝাইতেছে, ভরণীকে নহে। কারণ মৃগশিরার দুইটা দেবতা, প্রথম অর্দ্ধের দেবতা শুক্র এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধের দেবতা বুধ। যুদ্ধারম্ভের ১৮শ দিবস পরে বলরাম তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥"

অর্থাৎ, আজ ৪২ দিন গত হইল আমি বহির্গত হইয়াছি, পুষ্যানক্ষত্রে আমি বাহির হইয়াছি এবং শ্রবণায় ফিরিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধের শেষেই বলরাম প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রবণা নক্ষত্রে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, এবং ১৮ দিন পূর্ব্বে ঐ যুদ্ধ মৃগশিরা নক্ষত্রে আরম্ভ হইয়াছিল; ভরণীতে হয় নাই, কারণ ১৮ দিনে কখন তিনটী নক্ষত্রের অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না। চন্দ্র যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে থাকে, তখনই কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার পরের চতুর্দ্দশী কেবল মৃগশিরাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, বলদেবের বাক্যের দ্বারা মঘায় যুদ্ধারম্ভ নিরস্ত হইতেছে। এইজন্য তিনি বলেন যে "মঘাপদেন তৎসহচরাঃ পিতরো লক্ষ্যন্তে।"

পুনশ্চ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বাদশীর দিন রাত্রি যুদ্ধ কালে "ত্রিভাগ মাত্র শেষায়াং রাত্রৌ যুদ্ধমবর্ত্তত,"—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। এবং মৃত্যুর দিন ভীষ্ম বলিয়াছিলেন যে,—"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতা"—৪৮ দিন আমি শরশয্যায় শুইয়া আছি। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত ৪৮ দিন হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বাদশীতে রেবতী নক্ষত্রে হস্তিনাপুরে গিয়াছিলেন। তৎপরে মার্গশীর্ষের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী হইতে পৌষের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ পর্য্যন্ত, ৪২ দিন পাওয়া যায়। যুদ্ধ মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন আরম্ভ হইয়াছিল। নীলকণ্ঠ এই প্রকার গণনানুসারে দেখাইয়াছেন যে, পৌষের শুক্ল প্রতিপদের দিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠের মতানুসারে ভীষ্ম মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রমাপ্রসাদ স্থির করিয়াছিলেন যে, সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ৭০°—২৩,৫ মিনিট সরিয়া আসিয়াছে। ৫০৪৬ বৎসরে এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং ৫০৪৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৩১৩৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। ইহার ১৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা বনবাসে কাটাইয়া-

ছিলেন। এবং ইহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে অভিমন্যুর জন্ম হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাহার বয়স কখন ১৬ বৎসর হইতে পারিত না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এখন হইতে ৫০৪৬+১৩=৫০৫৯ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ, এখন হইতে ২৫২৯ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের জন্মের ২৫২৭ (৫০৫৯—২৫৩২) বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল।

পণ্ডিত রমাপ্রসাদ বরাহমিহির হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে,শকে ২৫২৫ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের অব্দ পাওয়া যায়। এখানে শক মানে তিনি শকরাজ বুদ্ধদেবের জন্মসময়কে বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব ২৫৩২ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ৫০৫৮ (২৫২৬+২৫৩২) বৎসর পাইয়া থাকি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গণনার সহিত ইহা মিলিতেছে।*

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে,(১—১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে,কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই ঘটনার ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩৬+১৩) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল। এখন (১৯০৯) কলির বয়স ৫০০৯। সুতরাং ৫০৫৮ (৫০০৯+৪৯) বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয় এবং সেই সময় হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

ইহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া যাইতে পারে, পণ্ডিত রমাপ্রসাদ তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

গীতার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কুরুদিগের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গীতাকারে রচিত হইয়া মহাভারতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

সর্ব্বজাতির সমুত্থান।

আজি কালি কায়স্থজাতি উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ সমুন্নয়নের চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর জাতির ঈর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিদ্বেষ কেন? জগৎ ক্রমোন্নতির একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল, কালে যাহা ক্ষুদ্র পাদপ ছিল, আজি তাহা বৃহৎ তরুতে পরিণত হইয়াছে। কল্য যে বালক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, ৫ বৎসর কি ১০ বৎসর পরে সে উচ্চতম শ্রেণীতে উত্থান করিবে। সূর্য্য প্রাতে নিম্ন গগনে বিরাজ করে, মধ্যাহ্নে উন্নত শীর্ষে উন্নীত হয়। সকলেরই উত্থান পতন আছে। আর হিন্দু জাতিই কি কেবল এক

* It may be mentioned that at one time it appeared to be that the saka of Varahamihir meant the era of Salibahan This however is new detected to be a mistake —The Theosophist, May 1908.

ভাবে থাকিবে? শূদ্র কি চিরদিন শূদ্র থাকিবে, এবং চিরকাল হিন্দুজাতি পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষ মত্ত হইয়া থাকিবে? ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

জাপানের ইতিহাসে কথিত আছে যে, তাহার মন্ত্রীরাজ, সামন্ত রাজগণ, সেমুরিয়া বা মহাপুরুষগণ, দেশের উন্নতির জন্য একেবারে তাহাদের উচ্চ জাতের পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের অধীন হইলেন। আমাদের কি এমন সময় আইসে নাই যে, যখন উচ্চ জাতির মহাত্মাগণ বলিবে যে, আমরা জাতীয় উন্নতির জন্য জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করিলাম। উচ্চবর্ণস্থ ভ্রাতৃগণ আসুন, আজি ভারতের এই চিরবিচ্ছেদানল নিবারণ করিয়া সকলের সমকক্ষ হই। প্রকৃত মহত্ত্ব জাতিতে নহে, গুণ ও জ্ঞানবলে। আজি আসুন, এই জ্ঞানবলেই যাহাতে মহত্ত্ব ঘোষিত হয়, তাহাই করা যাক্। চিরদিন জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ ও বিরোধ সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কায়স্থ জাতির সমুত্থান বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই। কায়স্থের সমুত্থান ও বৈদ্যের সমুত্থান আমি একই মনে করি। ফলতঃ উভয় জাতির ভিতর আমি অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। কিন্তু কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতে চান কেন? আমার বিশ্বাস, অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ যোদ্ধৃ ব্যবসা ভিন্ন অন্য বিষয়ে কায়স্থ হইতে সমুন্নত নহেন। ক্ষত্রিয় সমান ত তাঁহারা বর্ত্তমানেই আছেন। এ আর উন্নতি কি হইল? গলে সূত্র ঝুলান, ১২ দিন অশৌচ পালন, ইহাতে উন্নতি হয় না। চণ্ডাল, চর্ম্মকার ও হাড়ী, ইহারা যে ১১ দিন অশৌচ প্রতিপালন করে, ইহারা কি কায়স্থদের অপেক্ষা উচ্চ? কখনই নহে। সুতরাং এই অবান্তরিক প্রভেদ উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি বলি, যদি উত্থান করিতে হয়, বেদ বেদান্ত পাঠ করুন, নিজে ঈশ্বরের পূজার অধিকারী হউন, নারীগণকে ব্রহ্মবাদিনী করুন, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী গ্রহণ করুন, এবং ব্রাহ্মণরূপেই পরিণত হউন। কোন্ ব্রাহ্মণ রাজনারায়ণ বসু, কি কান্তিচন্দ্র মিত্র হইতে উন্নত? ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞানবলেই বা কোন ব্রাহ্মণ সত্যপ্রসন্ন, রাজেন্দ্রলাল, দ্বারকানাথ, রমেশচন্দ্র, সারদাচরণ হইতে উন্নত, বা প্রতিভা বলে মাইকেল, হীরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি হইতে সমুন্নত? তবে কেন ইহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবি না করেন?

আমার অনেক বৈদ্য-বন্ধু আমাকে নিন্দা করেন যে, আমি অম্বষ্ঠ সম্মিলনার অনুষ্ঠিত বৈদ্যের বৈশ্যত্বে কেন যোগ দেই না। আমি বলি বৈশ্যত্ব কেন? ব্রাহ্মণত্ব নহে না কেন? মহাত্মা গঙ্গাধরও কি সে কথা বলেন নাই? কোন্ দেশের বৈশ্যজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতায় বৈদ্যজাতির সমতুল্য? বৈদ্যজাতি প্রতিভা বলে চিকিৎসার আয়ুর্ব্বেদীয় দিকে একচ্ছত্র সম্রাট, এবং ইংরাজ আগমনে ভারতের সকল ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় হীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজিও সিবিলসার্জ্জনের হাতের ফেরতা রোগী বিজয়রত্ন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি আরোগ্য করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের পদধূলি লইতে কোন্ ব্রাহ্মণ অগৌরব মনে করেন? বোপদেব, মাধব কর, বিজয় রক্ষিত প্রভৃতিকে কে না ঋষি বলিয়া মনে করেন? রায় বাহাদুর হইবার পূর্ব্বে নবেন্দ্রনাথকে কেনা ব্রাহ্মণ তুল্য ভক্তি করিত? সুতরাং আমরা বৈশ্যত্ব লাভের প্রয়াসী হইব কেন? ব্রাহ্মণত্বই আমাদের লক্ষ্য, যদি উন্নতি লাভ

করিতে চাও, বৈদ্য ব্রাহ্মণ হও, বৈশ্যত্বে পতিত হইও না। নবজীবনের সমুত্থানে সকলে উত্থিত হও। অতুল প্রভাব-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জাতির উন্নত জীবন গ্রহণ করিতে কি সমর্থ হইবে না? সকলই আমাদের সাধ্য, কেবল এই জ্ঞান ধর্ম্ম লাভে আমরা সমর্থ হইব না? হিন্দুজাতির অন্যান্য বর্ণকেও আমি অনুরোধ করি, যখন "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ," তখন কেন তোমরা ব্রাহ্মণত্ব প্রয়াসী না হইয়া অন্যদিকে উত্থান করিতে চাও? ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ, ব্রহ্মই ত আমাদের সকলের জ্ঞাতব্য, তিনি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আশার সফলতা, চিন্তার আদর্শ, সাধনার সিদ্ধি, মুক্তির সোপান, এই ব্রহ্মই আমাদের লক্ষ্য। যদি তাহা হয়, তবে ব্রাহ্মণ হওয়াই সকল হিন্দু জাতির জীবনের লক্ষ্য। ক্ষত্রিয় হইতে চাও কেন? কলিতে হিন্দুজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব লোপ হইয়াছে, ভারতে কলির ক্ষত্রিয় ইংরাজ, বঙ্গদেশে ত ক্ষত্রিয়ই নাই, সুতরাং ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় বল কেন? বল, আমরা ব্রাহ্মণ হইব। এই ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতিই ভারতের উন্নতি, বেদ বেদান্ত উপনিষৎ গীতা এই ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ১২০৩ সালে ক্ষত্রিয়ের বিলোপ হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের সময়ে ক্ষত্রিয়ের সমাধি হইয়াছে, আর তাহার পুনর্জ্জন্মের কি প্রয়োজন? আজি ইংরাজও বলিতেছেন, তোমাদের ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন নাই। বরং যদি তোমরা ক্ষত্রিয় হইতে চাও, তবে ১৮৭৮ সালের ৩ আইন তোমাদের জন্য রহিয়াছে; বাস্তবিক আমাদের এক্ষণে ক্ষত্রিয়ত্বের আবশ্যকও নাই। রাজ্য রক্ষিত হইতেছে, অন্য দেশীয় অন্য জাতি আমাদের রাজারূপে সেবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

সমগ্র হিন্দুজাতি আজি উত্থান কর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরায় নিবোধত। এক দিন ব্রাহ্মণ জাতি ধরণীর গৌরব ছিলেন, আজি সেই গৌরব পুনরানয়ন কর। জ্ঞান ধর্ম্মের জ্যোতিই ভারতের নিয়তি, এই জ্ঞান ধর্ম্মই আমাদের লক্ষ্য। উঠ, ভাই গাত্রোত্থান কর, বীর বীর্য্য উদ্ধার কর। সম্প্রদায়-ভেদ ভাঙ্গিয়া দেও। শাস্ত্র তোমাদের স্বপক্ষ, বলিতেছে, নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং। ধর্ম্ম তোমাদের স্বপক্ষে, বলিতেছে, "দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।" তিনিই সকলের লক্ষ্য, তিনি "প্রেয়োপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" তাহা অপেক্ষা আমাদের কি প্রিয়? সেই ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ হও, আর সকল পরে পাইবে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বলিতেছেন, অগ্রে স্বর্গ রাজ্য অন্বেষণ কর, আর সকলই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অতএব আর নীচ বংশীয়েরা মধ্য পথ লইও না, সকলেই ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণগণকেও এই অনুরোধ, জগতের এই প্রধান লক্ষ্য, সর্ব্ব জাতির সমুন্নতি, Greatest good to the greatest number, এই মহান কার্য্যে সহায় হউন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিত্য নির্বিকার, সর্ব্ব প্রকার ভেদ রহিত ও অবয়ব রহিত, অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে আর ব্রহ্মকে সগুণ বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের সগুণত্ব স্বীকার করিলে এই সমুদয় দোষ হইতে পারে। প্রথমতঃ ব্রহ্মের অবয়ব। অংশ ও স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের বিকার ও বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। সমুদয় গুলিই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্রহ্মের সগুণই স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিত্যতায় ব্যাঘাত পড়ে। গীতাকার এক স্থলে বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা অব্যয় কারণ, তিনি অনাদি ও নির্গুণ(১৩।৩২) ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন "যাহার আদি আছে, তাহারই বিনাশ আছে। কিন্তু পরমাত্মা অনাদি, সুতরাং তাঁহার অবয়ব নাই। তাঁহার অবয়ব নাই, সুতরাং তাঁহার বিনাশ নাই। যাহা নির্গুণ, তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু যাহা সগুণ, তাহার গুণের বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং সগুণ বস্তু বিনাশশীল। কিন্তু পরমাত্মা নির্গুণ, সুতরাং তিনি অবিনাশী (সগুণোহি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি, অয়ম্ তু নির্গুণত্বাৎ চ ন ব্যেতি ইতি পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ)

"নেতি, নেতি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মাকে সগুণ বলা যাইতে পারে না। যাহার কোন প্রকার গুণ নাই, তাহাকে বর্ণনা করা অসম্ভব। এই জন্য বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম 'বাক্য ও মনের অগোচর।' মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন "শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা সম্ভব নহে, এই জন্য তুরীয়কে সর্ব্ব বিশেষণ বিহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে কি তিনি শূন্য? না, তিনি শূন্য নহেন। মিথ্যা কল্পনারও একটা কারণ না থাকিলে চলে না। শুক্তিকা, রর্জ্জু, স্থানু উষরাদি না থাকিলে রজত, সর্প, পুরুষ ও মৃগতৃষ্ণাদির কল্পনা হইতে পারে না। (কেহ কেহ এখানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন-) ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুরীয় ব্রহ্ম প্রাণাদি সমুদয় কল্পনার আস্পদ হইলেন। সুতরাং বলা উচিত, ঘটাদি যেমন জলাদির আধার, ব্রহ্মও তেমনি সমুদয় বস্তুর আধার। সুতরাং ব্রহ্ম 'শব্দ বাচ্য' শব্দ দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি নিরুপাধি, একথা বলা উচিত নহে। এ প্রকার আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। শুক্তিকাতে যেমন রজতাদির অভাব, ব্রহ্মেও তেমনি প্রাণাদি কল্পনা—অস্তিত্ব বিহীন। 'সৎ' এবং অসতের কোন প্রকার সম্বন্ধ, নাই (নহি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ), ইহা অবস্তু, সুতরাং কোন প্রকার বাক্য দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে না। গবাদি যেমন অন্য প্রকার প্রমাণের বিষয়ীভূত, আত্মা স্বরূপতঃ তদ্রূপ নহে, অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন, কারণ এই আত্মা নিরুপাধি। আত্মা অদ্বিতীয়; ইহাতে সামান্য বা বিশেষ কোন প্রকার ভাব নাই, সুতরাং আত্মা গবাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট জাতিভুক্ত নহেন। পাচকাদির ন্যায় আত্মা ক্রিয়াশীল,

ইহাও বলা যায় না, কারণ এই আত্মা অবিক্রিয়। নীলাদির ন্যায় আত্মাতে কোন প্রকার গুণ আছে, তাহাও বলা যায় না, কারণ আত্মা নির্গুণ। সুতরাং কোন প্রকার অভিধান দ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।"(মাণ্ডুক্য ভাঃ ৭)।

ব্রহ্মকে কেন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—গীতা-ভাষ্যেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। "শব্দ মাত্রই জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ প্রকাশক। জাতি—যেমন গো বা অশ্ব, ক্রিয়া—যেমন পাঠ করা বা রন্ধন করা, গুণ যেমন শুক্ল বা কৃষ্ণ, সম্বন্ধ যেমন ধনবান বা গোমান। ব্রহ্ম কোন জাতিভুক্ত নহেন, সুতরাং তিনি সদাদি শব্দবাচ্য নহেন। ব্রহ্ম গুণবান নহেন যে তাঁহাকে গুণদ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে, কারণ তিনি নির্গুণ। তিনি ক্রিয়া শব্দবাচ্যও নহেন, কারণ তিনি নিষ্ক্রিয়—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। ইঁহার সহিত কোন বস্তুর সম্বন্ধও নাই, কারণ ইনি এক ও অদ্বিতীয় এবং ইনি আত্মা। সুতরাং ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত যে, কোন শব্দ দ্বারাই ইঁহাকে বর্ণনা করা যায় না।"

গীঃ ভাঃ ১৩।১৩।

উপনিষদে বলা হইয়াছে 'ইহা নয়' 'ইহা নয়,—'নেতি' 'নেতি'—এই ভাবেই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে (বৃহঃ ২।৩।৬ ; ৪।৪।২২) ইত্যাদি।

শঙ্কর অসংখ্য স্থলে এই 'নেতি—নেতি' উদ্ধৃত করিয়া নিজমত সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ। উপাধিবশতই ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হয়। 'উপাধি' শব্দের অর্থ কি, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান হইয়াছে। স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম থাকিলে স্ফটিককে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্ফটিক কখন রক্তবর্ণ হয় না, তেমনি, অবিদ্যারূপ উপাধি বশতই ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখন সগুণ হয়েন না। আমরা শঙ্কর বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিলাম, শঙ্করের ভাষ্যদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

ব্রহ্ম মীমাংসা।

(১)

বেদান্ত-ভাষ্যের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উভয় লিঙ্গই (অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই) বলা হইয়াছে। 'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস' ইত্যাদি শ্রুতি সবিশেষ ব্রহ্মবোধক। "তিনি স্থূল নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন" ইত্যাদি শ্রুতি নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। এই সমুদয় শ্রুতিদ্বারা কি প্রতিপন্ন হইল? তিনি কি উভয়লিঙ্গ (অর্থাৎ তিনি কি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়ই)? না, তিনি একতর লিঙ্গ? আর যদি একতর লিঙ্গ হন, তবে তিনি কোন্‌টী—সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ? যখন উভয় লিঙ্গসূচক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন হয়ত মনে হইতে পারে, তিনি উভয় লিঙ্গই। কিন্তু আমরা বলি, বস্তুতঃ ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গত্ব স্বীকার করা যায় না। (ন তাবৎ স্বতঃ এব পরস্য ব্রহ্মণঃ উভয় লিঙ্গত্বম্ উপপদ্যতে) একটী বস্তু আছে, তাহার বিশেষ বিশেষ রূপও আছে। এই বস্তু স্বতঃ আবার ইহার বিপরীত হইবে, অর্থাৎ রূপাদি বিহীনও হইবে, ইহা আত্মবিরোধী কথা (ন হি একং বস্তু স্বতএব রূপাদি বিশেষো পেতং তদ্বিপরীতঞ্চেতি অভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ)। যদি

বল স্থানতঃ পৃথিব্যাদি উপাধি যোগে এরূপ সম্ভব হইতে পারে। আমরা বলি, না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। উপাধিযোগে একবস্তু অন্যরূপ হইতে পারে না। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কথন অলক্তাদি উপাধি যোগে অস্বচ্ছ হয় না। তবে যে অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপাধিসমূহ অবিদ্যামূলক। এখন যদি বল ব্রহ্ম অন্যতর লিঙ্গ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষ রহিত, নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ নিগুর্ণ, তিনি ইহার বিপরীত নহেন। (অতশ্চ অন্যতর লিঙ্গ পরিগ্রহেঽপি সমস্ত বিশেষ রহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্)। বেঃ ভাঃ ৩।২।১১।

(২)

অপর একস্থলে শঙ্কর বলিতেছেন "ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প একলিঙ্গ, ব্রহ্ম ইহার বিপরীত লিঙ্গও (অর্থাৎ সগুণ) নহেন এবং উভয় লিঙ্গও নহেন।" ৩।২।২১।

(৩)

"এই প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধি ভেদবশতঃই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব। কিন্তু পরমার্থতঃ ব্রহ্ম এ প্রকার নহেন (তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদ্যাপেক্ষ্যমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বম্, সর্ব্বজ্ঞত্বম্ সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতঃ)বেঃ ভাঃ ২।১।১৪।

(৪)

"শ্রুতিতে সৃষ্টিসূচক ও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাসূচক অনেক কথা আছে। এই যে সৃষ্টি শ্রুতি' ইহা পরমার্থ বিষয়িনী নহে। ইহা অবিদ্যাজনিত নাম-রূপ ব্যবহার যোগ্য কল্পনা। ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন করাই যে ইহার উদ্দেশ্য, ইহা কথন বিস্মৃত হইও না" (না চেয়ং পরমার্থ বিষয়াঃ সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদ্য পরত্বাৎ চ ইতি এতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্) ২।১।৩৩।

যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ব্রহ্ম স্রষ্টা, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "সৃষ্টি-শ্রুতি" সৃষ্টিপ্রতিপাদক নহে, সাবধান এ কথাটা কথনই ভুলিও না—এতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্।"

(৫)

"তবে কি ব্রহ্ম দুই প্রকার? হাঁ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম, এই দুই প্রকার। কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, হে সত্যকাম! এই যে 'ওঁ' ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পরব্রহ্মই বা কি এবং অপর ব্রহ্মই বা কি। ইহার উত্তর এই—যে স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি বিশেষণ নাই, যেস্থলে 'তিনি অস্থূল' এই প্রকার নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে—সেই স্থলেই পরব্রহ্মের কথা। আর যেস্থলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মে নামরূপাদি বিশেষণ অর্পণ করা হইয়াছে,—যেস্থলে বলা হইয়াছে 'তিনি মনোময় প্রাণ-শরীর ভারূপ ইত্যাদি, বুঝিতে হইবে সেইস্থলেই অপর ব্রহ্মের কথা। যদি বল এ প্রকার স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বসূচক শ্রুতির বিরোধী কথা বলা হয়, তাহার উত্তরে আমরা বলিব 'না ইহাতে কোন বিরোধ হয় না, কারণ অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি উপাধি বশতঃই এই প্রকার হইয়াছে। এই প্রকার স্বীকার করিলেই সমুদয় বিরোধ পরিহৃত হয়।' বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪

শঙ্কর বলিতেছেন, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নিগুর্ণ, উপাধিবশতঃই মনে হয়, তিনি সগুণ।

(৬)

"ব্রহ্মে সর্ব্ব প্রকার বিশেষ প্রতিষেধ করা

হইয়াছে। তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন...তিনি 'নেতি' 'নেতি' 'ইহা নহেন' 'ইহা নহেন' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির বলে এবং যুক্তি দ্বারাও বলা হইয়াছে, পরমাত্মাতে দেশ কালাদি বিশেষ স্বীকার করা যায় না। এস্থলে পূর্ব্ব পক্ষে এইরূপ বলেন—"উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, সুতরাং ব্রহ্মের অনেক শক্তি আছে।" ইহার উত্তর এই :—'না, ইহা বলিতে পার না। কারণ যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই, সেই সমুদয় 'বিশেষ নিরাকরণ' শ্রুতি 'অনন্যার্থ' (অর্থাৎ ইহা স্বার্থে,—নিজের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে. ইহার অন্য কোন অর্থ নাই, যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র অর্থ)। যদি আপত্তি কর, 'জগতের উৎপত্ত্যাদি শ্রুতিকে 'অনন্যার্থ' বলনা কেন?'—ইহার উত্তরে বলিব 'না, তাহা বলিতে পারনা, কারণ এই সমুদয় 'সৃষ্ট্যাদি শ্রুতি' একত্ব প্রতিপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে (জগদুৎপত্তিস্থিতি—প্রলয় হেতুত্ব শ্রুতেঃ অনেক শক্তিত্বং ব্রহ্মণঃ ইতি চেৎ ন। বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতীনাম্ অনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনামপি সমানম্ অনন্যার্থত্বম্ ইতি চেৎ। ন। তাসাম্ একত্ব প্রতিপাদন পরত্বাৎ)। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি মূলক শ্রুতি। এই জন্য ব্রহ্মে অনেক শক্তি আছে,ইহা স্বীকার করা যায় না (এবম্ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনাম্ ঐকাত্ম্য অবগম পরত্বাৎ ন অনেক শক্তি যোগঃ ব্রহ্মণঃ) বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪।

(৭)

'অনেক লোকে নেত্রের তিমির দোষে এক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া মনে করে, কিন্তু চন্দ্রমা কখন অনেক হয় না। তেমনি, নাম রূপ মূলক ভেদ অবিদ্যা মূলক। ইহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত, এই উভয়াত্মক। ইহা বস্তু কি অবস্তু, তাহা কিছুই বলা যায় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভেদ বশতঃ ব্রহ্মকে সর্ব্ব ব্যবহারাস্পদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পারমার্থিক ভাবে তিনি সর্ব্ব ব্যবহারের অতীত ও অপরিণামী। পরিণাম শ্রুতি সমূহ পরিণাম প্রতিপাদনার্থ অভিহিত হয় নাই (অর্থাৎ অনেক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু এ সমুদয় শ্রুতির অর্থ ইহা নয় যে, সত্য সত্যই ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন)। সর্ব্ব ব্যবহার বিহীন ব্রহ্মাত্ম ভাব প্রতিপাদন করাই এই সমুদয় শ্রুতির উদ্দেশ্য। (ন চ ইয়ম্ পরিণাম শ্রুতিঃ পরিণাম প্রতিপাদনার্থাঃ, সর্ব্ব ব্যবহারহীন—ব্রহ্মাত্ম ভাব—প্রতিপাদনার্থাঃ তু এতাঃ) বেঃ ভাঃ ২।১।১৭।

(৮)

"ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই অথচ বলা হয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। ইহার অর্থ কি? এই ভেদ উপন্যাস অবিদ্যা-জনিত কল্পনা বই আর কিছুই নহে অর্থাৎ অবিদ্যা বশতই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।" (প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ব বিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি,—একদপি অবিদ্যাকল্পিত রূপ ভেদোপন্যাসেন উক্তমেব) বেঃ ভাঃ ২।১।৩১।

(৯)

"পুরুষ কলাবিহীন; কিন্তু ষোড়শ কলারূপ উপাধির জন্যই অবিদ্যাবশতঃ নিষ্কল পুরুষকে কলাযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। অবিদ্যা বশতঃ পুরুষে যে উপাধি কলা আরোপ করা

হয়, বিদ্যা দ্বারা তাহা অপনয়ন করিয়া পুরুষকে নির্বিশেষ রূপে দেখাইতে হইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যে এই পুরুষ কলাদির উৎপাদন কারণ। এই অদ্বিতীয় শুদ্ধতত্ত্বে যদি প্রাণাদি আরোপ করা না যায়, তাহা হইলে ইহার বিষয়ে কোন কথাই বলা যায় না। এই জন্যই ইহাতে কলা সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আরোপ করা হইয়াছে" প্রঃ ভাঃ ৬.২।

শঙ্কর বলিতেছেন—ব্রহ্মে কোন বিশেষণ না দিলেও কোন বিষয়ের বর্ণনা হইতে পারে না। এখন উপায় কি? শঙ্কর বলিতেছেন—প্রথমে বল 'ব্রহ্ম কলাযুক্ত'—তাহার পর বল 'ব্রহ্ম কলাবিহীন'।

(১০)

গীতাকার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে ঈশ্বরের সগুণত্ব সূচক এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

'সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মের হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাহার চক্ষু, শির, ও মুখ এবং সর্ব্বত্র তাহার কর্ণ। তিনি সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন" গীঃ ১৩।১৩।

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ব্রহ্ম সগুণ কিন্তু শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—'সেই জ্ঞেয় বস্তুর অর্থাৎ পরমাত্মার সর্ব্বত্র হস্ত পদ'—এখানে সমুদয় প্রাণীর ইন্দ্রিয়াদি উপাধি দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব ভাবনা করা হইয়াছে। ক্ষেত্ররূপ উপাধির জন্যই ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এই ক্ষেত্রের পাণি পাদাদি অনেক প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু ক্ষেত্রোপাধি-জনিত ক্ষেত্রজ্ঞের যে ভিন্নতা, তাহা মিথ্যা। ইহা অপনয়ন করিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, তিনি 'সৎ' ও নহেন, 'অসৎ' ও নহেন। 'সর্ব্বত্র তাহার হস্ত' 'সর্ব্বত্র তাহার পদ' ইত্যাদি উপাধি মূলক মিথ্যা রূপকে যে জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, ইহা কেবল জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব প্রকাশক। সম্প্রদায়-বিদ্‌গণও বলেন যে "যিনি প্রপঞ্চবিহীন, তাঁহাকে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা বর্ণনা করা হয় (অর্থাৎ প্রথমে নিরুপাধি ব্রহ্মে গুণ আরোপ করা হয়) এই দোষ সংশোধনার্থ শেষে বলা হয়, তাঁহাতে কোন গুণ নাই।"

শঙ্কর বলিতেছেন, ব্রহ্মে অনেক বিশেষণ আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই যে ব্রহ্মে এই সমুদয় গুণ আছে, তাহা নহে। 'ব্রহ্ম আছেন' এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মে গুণ আরোপ করা হয়। অবস্তুতে কোন গুণ আরোপ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মে যখন গুণ আরোপ করা হইয়াছে, তখন বুঝিতেই হইবে যে "ব্রহ্ম অস্তিত্ববান"। 'ব্রহ্ম নিগুণ'—হলা বলিলে লোকে মনে করিতে পারে, 'ব্রহ্ম বুঝি অবস্তু তিনি বুঝি শূন্যময়'—এই আশঙ্কায় বলা হইল "ব্রহ্ম সগুণ।" ইহা শুনিয়া বা শেষে লোকে মনে করে "ব্রহ্ম বুঝি প্রকৃত পক্ষেই সগুণ'—এই আশঙ্কায় আবার ঐ সমুদয় গুণের অপবাদ করা হইয়াছে।

(১১)

পূর্ব্ব পক্ষ বলিতেছেন—ব্রহ্ম বহুরূপা, বৃক্ষ যেমন বহু শাখান্বিত, তেমনি ব্রহ্মও বহুশক্তি প্রবৃত্তিযুক্ত (এবম্ অনেক শক্তি প্রবৃত্তি যুক্তম্ ব্রহ্ম), সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখাদি রূপে বহু, সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেন তরঙ্গাদি রূপে বহু, মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক, কিন্তু ঘটশরাবাদিরূপে বহু—তেমনি, ব্রহ্মের

একত্ব একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার এবং নানাত্বাংশে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে " সিদ্ধান্তী বলিতেছেন— 'না, এরূপ নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী দৃষ্টান্ত বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই সত্য, 'বাচারম্ভণ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিকার জাত বস্তুত মিথ্যাত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। বেঃ ভাঃ ২।১।১৪।

(১২)

"যখন 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি অভেদ সূচক বাক্য দ্বারা অভেদ জ্ঞান জাগ্রত হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব সমুদয়ই অপগত হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত এই যে ভেদ ব্যবহার, ইহাতে সম্যকজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন কোথায় থাকে সৃষ্টি, আর কোথায় থাকে অহিত করণাদি দোষ। (অপগতম্ ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বম্, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বম্ ··তত্র কুতঃ এব সৃষ্টিঃ কুতঃ বা অহিত করণাদয়ঃ দোষাঃ) বেঃ ভাঃ ২।১।২২।

(১৩)

"পূর্ব্ব পক্ষের উক্ত—বেদবাদিগণ আত্মায় সৃষ্টি কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার স্বরূপের পরিণাম হয় এবং আত্মা অনিত্যাদি দোষ দুষ্ট হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ত পক্ষের উত্তর—না, এপ্রকার হয় না। আত্মা এক হইলেও ইহাতে 'অবিদ্যামূলক নামরূপ উপাধি' এবং 'অনুপাধি কৃত বিশেষ'—এতদুভয়ই স্বীকার করা যাইতে পারে। অবিদ্যা-জনিত নামরূপ উপাধিই বন্ধন ও মোক্ষমূলক শাস্ত্রের বিষয়। এই প্রকার শাস্ত্রে উপাধি বিশেষের কথা বলা হইয়াছে, এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে আত্মাতে অবিদ্যাজনিত উপাধি আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাধি বিহীন এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব তার্কিক বুদ্ধির অগম্য, অভয় ও মঙ্গল স্বরূপ। ইহাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিম্বা ক্রিয়া কারক বা ফল কিছুই নাই (ন তত্র কর্তৃত্বম্ ভোক্তৃত্বম্ বা ক্রিয়াকারক ফলম্ চ স্যাৎ) প্রঃ ভাঃ ৬।৩।

(১৪)

"পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—ব্রহ্ম সর্ব্বগত সকলের আত্মা, চুল মাত্র স্থান হইতেও তিনি অন্তরে নহেন। অথচ উপনিষদে বলা হইয়াছে—পিপীলিকা যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও তেমনি জীবের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। একথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? সিদ্ধান্তী বলিতেছেন— এ প্রশ্ন ত অতি সামান্য. ইহা অপেক্ষাও গুরুতর প্রশ্ন হইতে পারে। এ কথাও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, "তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন, কিছু না লইয়াই লোক সমূহ সৃষ্টি করিলেন, জল সমূহ হইতে পুরুষের উপাদান লইয়া তাহাকে গঠন করিলেন। সেই পুরুষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মুখাদি ফাটিয়া বাহির হইল; মুখাদি হইতে অগ্ন্যাদি লোকপাল উৎপন্ন হইল, তাহাদিগের সহিত ক্ষুধাতৃষ্ণার যোগ হইল, তাহারা আশ্রয় স্থান প্রার্থনা করিল, তাহাদিগকে গবাদি পশু দেখাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিল। অন্ন সৃষ্ট হইয়াই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, পুরুষ বাগাদি দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল ইত্যাদি।" 'ব্রহ্ম মস্তক বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং এই সমুদয় ঘটনা একই প্রকার। সুতরাং কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'এ সমুদয়কেই অযৌক্তিক বলা হউক। কিন্তু আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে আত্মার অববোধের জন্যই এই সমুদয়

বলা হইয়াছে, ইহা অর্থবাদ সুতরাং ইহাতে দোষ নাই (অত্র আত্মাববোধার্থ মাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সৰ্ব্বঃ অয়ম্ অর্থবাদঃ ইতি অদোষঃ)। অথবা এই কথা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, লেকে শিক্ষার জন্য যেমন মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করা হয়, তেমনি বলা হইয়াছে যে, মায়াবীর ন্যায় মহামায়াবী সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান দেবতা সহজে ইহার অববোধ ও প্রতিপত্তি করিবার জন্য এই সমুদয় করিয়াছেন (মায়া বিবৎ বা মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বম্ এতৎ চকার সুখাববোধন—প্রতিপত্ত্যর্থং লোকবৎ আখ্যায়িকা প্রপঞ্চঃ ইতি যুক্ততরঃপক্ষঃ)। এই সৃষ্টির আখ্যায়িকা জ্ঞানে কোন ফল নাই, কিন্তু আত্মার একত্ব জ্ঞানে অমৃতত্ব ফল হয়, ইহা সর্ব্ব উপনিষদের উপদেশ। (ঐতঃ উপঃ ভাষ্য ৪র্থ অধ্যায় আরম্ভ)।

(১৫)

প্রাণীদিগের অবিদ্যাদি দোষ বীজস্বরূপ। এই বীজ দ্বারাই 'কলা' সৃষ্ট হয়। চক্ষুর প্রান্ত ভাগে অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়ন করিলে যেমন দ্বিচন্দ্র, মশক, মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, কিম্বা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নানা প্রকার বস্তু সৃষ্টি করে, অবিদ্যা কর্ত্তৃক সৃষ্ট কলাদিও তেমনি। (এবম্ এতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদি দোষ বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ তৈমিরিক দৃষ্টি সৃষ্টাঃ ইব দ্বিচন্দ্র মশক মক্ষিকাদ্যাঃ স্বপ্নদৃক্ সৃষ্টাঃইব ইত্যাদি) প্রঃ ভাঃ ৬।৪।

(১৬)

"এবিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মাইবার জন্যই আত্মাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কল্পনা এবং এবং ক্রিয়াকারক ও কলাদি আরোপ করা হইয়াছে। আবার 'নেতি' 'নেতি' এই বাক্য দ্বারা অধ্যারোপিত বিশেষ অপনয়ন পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার প্রকৃত তত্ত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। (এত দৈব অর্থস্য সম্যক্ প্রবোধায় উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়াদি কল্পনা, ক্রিয়া কারক কলাধ্যারোপণা চ আত্মনি কৃতা তদপোহেন চ 'নেতি' 'নেতি' অধ্যারোপিত বিশেষাপনয়ন দ্বারেন পুনঃ তত্ত্বম্ আবেদিতম্)। যেমন এক হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধতম পর্য্যন্ত সংখ্যা জ্ঞানের জন্য রেখাতে 'এই এক' 'এই দশ' 'এই শত' 'এই সহস্র' ইত্যাদি ভাব আরোপ করিয়া সংখ্যা গ্রহণ করান হয়, বস্তুতঃ সংখ্যাতে রেখাত্ব নাই, কিম্বা যেমন অকারাদি অক্ষরোপদেশের জন্য পত্রে মসীরেখাদি সংযোগ করিয়া বর্ণতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, বস্তুতঃ অক্ষর সমূহে পত্রত্ব, মসাত্বাদি কিছুই বর্ত্তমান নাই—তেমনি উৎপত্ত্যাদি অনেক উপায়ে এক ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আবার কল্পিত উপায় জনিত দোষ সংশোধনার্থ 'নেতি, 'নেতি' বলিয়া এই তত্ত্বের উপসংহার করা হইয়াছে" বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২৫।

(১৭)

পূর্ব্বপক্ষের উক্তি—"উৎপত্তির পূর্ব্বে সমুদয়ই এক অদ্বিতীয় বস্তু রূপে ছিল। এই সমুদয় জীব উৎপন্ন হইবার পর ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—না ইহা হইতে পারে না। কারণ উৎপত্তি সংক্রান্ত শ্রুতির অন্য অর্থ আছে। ... .মৃত্তিকা লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তের উপন্যাস দ্বারা যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার একত্ব বিজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। যেমন প্রাণ-সংবাদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য রাগাদি, অসুর পাপ্মা, বেধা

ইত্যাদির আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে, সৃষ্টি ব্যাপারেও তাহাই। গৌঃ কারিকা ভাষ্য ৩।১৫।

উপনিষদে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কে বড, এই বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, প্রাণই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, প্রকৃত পক্ষেই যে ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্যই একটী আখ্যায়িকা রচনা করা হইয়াছিল। সৃষ্টি ব্যাপার সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। আত্মা ও ব্রহ্ম একই, এই সত্যটী বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টিরূপ আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে।

(১৮)

পূর্ব্বপক্ষ—"যাহারা সৃষ্টি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতির প্রামাণিকতা কোথায় ?"

সিদ্ধান্ত পক্ষ—ইহা সত্য যে সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ অন্য। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ।

পূর্ব্বপক্ষে—যেখানে মুখ্য ও গৌণ, উভয় অর্থই হইতে পারে, সেস্থলে মুখ্য অর্থই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

সিদ্ধান্তী—না, ইহা হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টি অপ্রসিদ্ধ এবং নিষ্প্রয়োজন। কাঃ ভাঃ ৩।২৩।

(১৯)

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যেমন 'প্রাণসংবাদ' রচিত হইয়াছে, তেমনি সৃষ্টি না থাকিলেও আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সৃষ্টিকল্পনা করা হইয়াছে। গৌঃ ভাঃ ৩।২৪।

(২০)

"সুতরাং আত্মার একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই সমুদয় বেদান্তে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কল্পনা করা হইয়াছে। এ সমুদয়ে প্রত্যয় স্থাপন করাইবার জন্য নহে (তস্মাৎ একরূপৈকত্ব প্রত্যয়দার্ঢ্যায় এত সর্ব্ববেদান্তেষু উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদি কল্পনা, ন তৎপ্রত্যয় করণায়) বৃহঃ ভা ২।১।২০।

(২১)

'উপনিষদে সুবর্ণ, মণি লৌহ, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎসৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই এই সমুদয় উক্ত হইয়াছে, উৎপত্ত্যাদি ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য এ সমুদয় কথা বলা হয় নাই। একত্বপ্রত্যয় দার্ঢ্যায় সুবর্ণমণি লোহাগ্নি স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তাঃ ন উৎপত্ত্যাদি ভেদ প্রতিপাদনপরাঃ) বৃঃ ভাঃ ২।১।১০

(২২)

পরমাত্মার একত্ব প্রত্যয় দৃঢ় করিবার জন্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রতিপাদক বাক্য (পরমাত্মৈকত্ব প্রত্যয় দ্রঢিম্নে উৎপত্তি স্থিতি লয়-প্রতিপাদকানি বাক্যাণি) বৃহঃ ভাঃ ২।১।২০।

(২৩)

সুতরাং উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি আত্মার একত্ব সূচক (তস্মাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতয়ঃ আত্মৈকত্ব প্রতিপাদন পরাঃ) বৃঃ ভাঃ ২।১।২০।

(২৪)

লোকে আত্মাতে ভেদ দর্শন করে, এই ভেদ বিদূরীত করিয়া আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই সৃষ্টিসূচক বাক্যের

অবতারণা (ভেদ দর্শনাপবাদাচ্চ স্বষ্ট্যাদি বাক্যানাম্ আত্মৈকত্ব দর্শনার্থ পরত্বোপপত্তিঃ) বৃঃ ভাঃ ১।৪। শঙ্কর বহু স্থলে বলিতেছেন যে "ব্রহ্মের একত্ব বুঝাইবার জন্য স্বষ্ট্যাদি কল্পনা।" ইহার অর্থ কি? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক—"অগ্নি হইতে যেমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই সমুদয় নির্গত হইয়াছে।" শঙ্কর বলিতেছেন, অগ্নি হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা হইতে স্ফুলিঙ্গ পৃথক বস্তু, ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই। উভয়ের একত্ব বুঝাইবার জন্যই উক্ত উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন একই বস্তু, তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু। যে বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মই। এই একত্ব বুঝাইবার জন্যই উৎপত্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যাহাকে ব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়—তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন কোন বস্তু রহিয়াছে এবং সেই বস্তু ব্রহ্মে অবস্থিত, ইহা বুঝাইবার জন্য 'স্থিতি'র কথা বলা হয় নাই। উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই 'স্থিতি'র উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বস্তু ব্রহ্মে বিলীন হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতিতে প্রলয়ের কথা বলা হয় নাই। উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই এই সমুদয় গল্প রচনা করা হইয়াছে।

(২৫)

গৌড়পাদকারিকাতে (৪।৪২) এইরূপ লিখিত আছে :—

"উপলব্ধি বশতঃ এবং ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং অজাতি অর্থাৎ বিনাশকে তাহারা সর্ব্বদাই ভয় করিয়া থাকে। এই সকলের লোকের জন্যই জ্ঞানীগন 'জাতি' অর্থাৎ উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন।"

শঙ্করের ভাষ্য এই :—'উপলম্ভ' শব্দের অর্থ উপলব্ধি, সমাচার অর্থ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের আচরণা। এই দুইটী কারণে অনেকে বস্তুর অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে। এই সমুদয় মন্দবিবেকীদিগের একটী উপায় করিবার জন্যই 'উৎপত্তি' বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এমত গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু যাহারা বেদান্ত অভ্যাস করিতেছে, তাহারা স্বয়ং অজ, অদ্বিতীয়, আত্মার বিষয়ে বিবেকবান হইবে। পরমার্থ দৃষ্টিতে উৎপত্তি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় নাই। অবিবেকী শ্রোত্রিয়গণ স্থূল বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা করে যে, ইহা বিশ্বাস করিলে 'আত্মনাশ' হইবে। এই প্রকার কল্পনা করিয়া তাহারা সর্ব্বদাই ভীত হইয়া থাকে। ইহাদিগের একটা গতি করিবার জন্য 'উৎপত্তি' বিষয়ক উপদেশের অবতারণা করা হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম নিত্যই নিগুর্ণ, স্বরূপতঃ তিনি সগুণ নহেন। নিম্নলিখিত কারণে তাহাতে সগুণত্ব আরোপ করা হয়।

(১) জবাকুসুম রূপ উপাধির জন্য যেমন স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়, ভ্রমবশতঃ যেমন লোকে রজ্জু, শুক্তিক, স্থানু, ঊষরভূমি ও একচন্দ্রকে সর্প, রজত, পুরুষ, মৃগতৃষ্ণিকা এবং বহুচন্দ্র বলিয়া কল্পনা করে, লোকে যেমন ভ্রমবশতঃ শূন্যে গন্ধর্ব্ব নগর দর্শন করে, তেমনি অবিদ্যাবশতঃ লোকে নিগুর্ণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম করে।

(২) ব্রহ্মকে নিগুর্ণ বলিলে লোকে তাঁহাকে অবস্তু বলিয়া ভ্রম করে, এইজন্য তাঁহাকে শাস্ত্রে সগুণ বলিয়া বর্ণনা করা হই-

য়াছে। আবার ব্রহ্ম 'নেতি' 'নতি'—ইহা নয়, ইহা নয়, এইরূপ বলিয়া সগুণত্ব আরোপ রূপ দোষও পরিহার করা হইয়াছে।

(৩) প্রকৃত অদ্বৈতবাদের কথা শুনিলে মূর্খলোকে ভীত হইয়া থাকে। তাহারা ভাবে 'তবে বুঝি আমরা নাই'—'তবে বুঝি আমরা থাকিব না'—'তবে বুঝি আত্মীয় স্বজন ও এই সমুদয় ভোগ্য বস্তু নাই' ইত্যাদি। এই সমুদয় লোকের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে।

(৪) ব্রহ্মের একত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির গল্প রচনা করা হইয়াছে।

প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, ব্রহ্ম 'একরস' নির্ব্বিশেষ নির্গুণ; তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, অংশবিহীন ও অবয়ববিহীন। ইহা ভিন্ন যাহা, তাহা অবস্তু।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

অতৃপ্ত।

১

নব ইন্দু পূত চিতোরের,
পুত্র সিংহ ভারত-গৌরব,
ষোড়শ বর্ষীয় বীর, পারিজাত পৃথিবীর,
চিতোরে মাথায়ে গেলে
অমর সৌরভ!

২

কে দেবতা এসেছিলে দেশে,
নরত্বের আবরণ নিয়া,
ভস্ম মাখা বৈশ্বানর, মেঘাবৃত প্রভাকর,
না জানিতে না চিনিতে
গেলে যে চলিয়া!

৩

তুমি বুঝি ছিলে পুরাকালে
মৃত্যুঞ্জয় যোগীন্দ্র শঙ্কর,
বিনাশি ত্রিপুরাসুর, রক্ষিলে স্বরগ পুর,
কাল কূট করি পান
রক্ষিলে অমর?

৪

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে অরিন্দম
বিষ্ণুভক্ত দেবতা প্রহ্লাদ,
অভিচারী দ্বিজদলে, বাঁচাইলে যজ্ঞানলে,
ঝাঁপ দিলে সিন্ধুজলে
মা গণি প্রমাদ?

৫

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে নরোত্তম
সত্যব্রত হরিশ্চন্দ্র ধীর,
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে, বিকাইলে অকাতরে
রাজ্য ধন দারা সুত
ও রাজশরীর?

৬

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে ভগীরথ
উদ্ধারিতে পিতৃলোক গণে,
মহতী তপস্যা-বলে, তুষিয়া ত্রিদশ-দলে,
পতিতপাপনী গঙ্গা
আনিলে ভুবনে?

৭

অথবা,
তুমি বুঝি ত্রেতা যুগে ছিলে,
শ্রীরামের "ভরত" অনুজ,
প্রাপ্ত রাজ্য পরিহরি, ভ্রাতৃনির্ব্বাসন স্মরি,
পূজিলে—বিতৃষ্ণ সুখ,
ভ্রাতৃ-পদাম্বুজ?

৮

অথবা,
তুমি বুঝি ছিলে দ্বাপরের
দেবব্রত—জাহ্নবী-তনয়
যতী, ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয়,
চিরজয়ী, ইচ্ছামৃত্যু
নিষ্কাম নির্ভয়!

৯

পুনঃ বুঝি এলে কলিযুগে
দেখাইতে অমর মহিমা,
বিশ্বপ্লাবী প্রীতিভক্তি, আত্মত্যাগ অনাসক্তি,
সসীম মানব—নাহি
মহত্ত্বের সীমা।

১০

যুগে যুগে আসিয়াছ তুমি
কার্য্য শেষে গিয়াছ চলিয়া,
ভূতলে ত্রিদিব দৃশ্য বিস্ময়ে দেখেছে বিশ্ব,
নিরেট পাষাণ কত,
গিয়াছে গলিয়া!

১১

বীরাঙ্গনা বীর-প্রসবিনী
কর্ম্মদেবী শতধন্যা আজি,
পুত্র কন্যা বধূ সনে চণ্ডী অবতীর্ণা রণে
সবে মিলে স্বর্গে যায়,
দীপ্ত রত্ন রাজি!

১২

বীর তব পুষ্প রথ পানে
চেয়ে তব কোটি কোটি ভাই,
আবার আসিবে কবে, কোন্ যুগে দেখা হবে,
অতৃপ্ত চিতোর-চিত
মনে রেখ তাই।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

গিরিজাপ্রসন্ন। (৩)

ইন্দ্রিয়-সংযম।

কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন পিতার আদেশ ক্রমে বরিশাল-বারে যোগদান করেন। বরিশালে গিরিজাপ্রসন্নের বাসাবাড়ী আছে, তিনি সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বাসাবাড়ীর সন্নিকটে বেশ্যালয় ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গিরিজাপ্রসন্ন সুস্বর হারমোনিয়ম বাদন করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। একদিন আদালত বন্ধ ছিল, গিরিজাপ্রসন্ন অবকাশ পাইয়া তাঁহার বাদ্যযন্ত্রটী খুলিয়া একটা সময়োচিত রাগিণীর আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহার বাদ্যযন্ত্রের চিত্তহারী স্বর শ্রবণ করিয়া, অনতিদূর হইতে, একজন বারাঙ্গনা, হারমোনিয়মের রাগিণীর সঙ্গে একটা সুললিত সঙ্গীত ধরিয়া দিয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্রটী বন্ধ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার আর এ বাসায় থাকা হইবে না, অদ্যই এই বাসা পরিত্যাগ করিব। তোমরা আমার বাসোপযোগী স্থান স্থানান্তরে নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল।

তিনি চরিত্র বাঁচাইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য বারবিলাসিনীর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এরূপ আরও ৩।৪টী ঘটনায় তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযম প্রবৃত্তির বলবতী স্পৃহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার চরিত্র অনুধাবন কর, তাহাতেও যে শিক্ষা পাইবে, তাঁহার পুস্তক পাঠ কর, তাহাতেও সেই শিক্ষা লব্ধ হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ছায়া যেন আমরা তাহার পুস্তক মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখি। ইন্দ্রিয় নিগ্রহাভ্যাস সময়ে লোকের প্রলোভনের অন্তরালে থাকা কর্ত্তব্য, কি প্রলোভনের ভিতরে থাকিয়া ইন্দ্রিয় জয়ে সচেষ্ট হওয়া বিধেয়, এতদ্বিষয়ে গিরিজাপ্রসন্ন গৃহলক্ষ্মীর প্রথম ভাগে যে দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, আমরা সাধা-

য়ণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"মানুষের সাধুতাই প্রকৃতি—অসাধুতা বিকৃতি মাত্র। লোকে যে কুকার্য্য করে, সে কতকটা জোর করিয়া, কতকগুলি উদ্ধত ইন্দ্রিয়ের বলে শান্ত হৃদয়কে পরাস্ত করিয়া, ঘটনাধীন সে বল ক্ষীণ হইয়া গেলে—ইন্দ্রিয়গণ শান্তভাব ধারণ করিলে, হৃদয় আবার অনুতাপের সাহায্যে প্রবল হইয়া উঠে। তখন এমনি হইয়া পড়ে যে, পূর্ব্বে সে যত সাধু ছিল; এখন তদপেক্ষা দ্বিগুণতর সচ্চরিত্র হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই—পূর্ব্বে সে সৎ থাকিলেও তাহাকে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। সে সংগ্রামে ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিত, সুতরাং সর্ব্বদা তাহাকে শঙ্কিত থাকিতে হইত। কখনও বা প্রলোভনের দূরে থাকিয়া সাধুতা রক্ষা করিতে হইত। কখন বা সামান্য সংসার জ্ঞান বা সুখ্যাতির ইচ্ছা দ্বারা ইহাকে পরাস্ত করিতে হইত। কিন্তু ভোগ সমাপ্তি হইলে, সে যখন পুনরায় সৎ হয়, ইন্দ্রিয়গণ তাহার উপভোগ্য সুখরাশির অসারতা বুঝিতে পারিয়া আর কখন তাঁহাদের হৃদয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, সুতরাং সে বিনা ক্লেশে প্রলোভনের আকর্ষণী শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব্বপ্রকারের সাধুদিগের অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক, প্রকৃত সাধুতা দেখিবার জন্য যে আমাদিগের প্রলোভনের সামনে পড়িয়া যুঝিতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগের মত দুর্ব্বল লোকের প্রলোভন হইতে দূরে থাকা ভাল। যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করুন, আমরা ইন্দ্রিয়-সেবক, আমাদিগের অতটা হইয়া উঠিবে না। বিষ পান করিয়া অমর হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।"

উপদেশ প্রদানে দক্ষলোক এ সংসারে সংখ্যাতীত। কিন্তু উপদেশ পালনে যত্নবান লোকের সংখ্যা বড়ই বিরল। নীতি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকরী। গিরিজাপ্রসন্ন এই সারগর্ভ বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নীতি শিক্ষা দিতেন। তিনি আপনার মনন শক্তির প্রভাবে যে ছবি বা আদর্শ অঙ্কিত করিয়া লইতেন, তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য, শুধু ইন্দ্রিয়াদির দমন কেন, জীবনটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। নিজ মনন-রচিত আদর্শে যাঁহার যতদূর আসক্তি, তিনি এই পৃথিবীতে ততদূর অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব কি?

বরিশালে আইন-ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতা।

গিরিজাপ্রসন্ন বরিশাল ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেন না। উকীলদের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে যেরূপ শক্তি ও গুণলাভের দরকার, তাহা তাঁহাতে অপ্রতুল ছিল না। তিনি আইনবোদ্ধা, সুবক্তা ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠ উকীলবর্গের সহায়তা ও শ্রদ্ধালাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। আর্থিক অবস্থাও তাঁহার অনুকূলে ছিল। শরীর সবল ও শ্রমসহিষ্ণু করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই সব অবস্থা যাহাদের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহারাই ঐ ব্যবসায় অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু গিরিজাপ্রসন্নের এ সব অবস্থা তাঁহার বিরুদ্ধে না থাকিলেও, তাঁহার পসার করার পথে একটী বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়াছিল।

১ম বিঘ্ন। —এ সংখ্যায় না বলাই ভাল।

২য় বিঘ্ন। সাহিত্য সেবাই তিনি লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়ার উপর স্থির করিয়া তৎকার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। যে যে কার্য্যে ব্রতী, তাহাতেই কিছুদিন পরে তাহার একটা আসক্তি বা অনুরাগ জন্মে। গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্য-সেবায় অনুরাগী হইয়া অভীষ্ট পথে

অগ্রসর হইতেছিলেন, কাজেই অন্যকার্য্য তাঁহার নিকট তদ্রূপ গন্তব্যপথ উল্লঙ্ঘন করার সহায় বলিয়া মনে হইল না। যে যে কার্য্যই করুক না কেন, সেই কার্য্যটীকে তাহার জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া লওয়া চাই। গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্য সেবা তাঁহার মহৎ জীবনের উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহার পুস্তকপাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। যদি পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাই তাঁহার সাধুজীবনের একটা প্রধানতম বিশেষত্ব।

সত্যপ্রিয় মথুরানাথ যখন জ্ঞাত হইলেন যে, পুত্রের ব্যবসার দিকে বিশেষ আগ্রহ নাই, তখন তিনি তজ্জন্য বিশেষ মনোক্ষুণ্ণ হইলেন না। পুত্রের যশ ও মান অর্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। গিরিজাপ্রসন্ন বরিশাল বাস কালে অনেক পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রামের ও বিদেশের অনেক ছাত্র তাঁহার বাসায় আসিয়া অধ্যয়ন করিত। তিনি কোন কোন বালকের শিক্ষার ব্যয়ও নিজে বহন করিতেন। কয়েকজন আফিসের কর্ম্মচারীও তাঁহার বাসায় আসিয়া কার্য্যনির্ব্বাহের সুবিধা লাভ করিত। লেখা পড়া কিম্বা অন্য কোন সদুদ্দেশ্যের জন্য কোন লোক তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইলে প্রায়ই প্রত্যাখ্যাত হইত না।

প্রশংসা-লাভের অনিচ্ছা।

একবার বরিশালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আজকাল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, একের দুঃখে অপরে ব্যথিত হয়, একের অভাব অপরে বিমোচন করিতে অগ্রসর হয়, একের সর্ব্বনাশে অপরে সর্ব্বনাশগ্রস্ত মনে করে। কিছুকাল পূর্ব্বে এ ভাবটা এদেশ হইতে কিছু দিনের জন্য তিরোহিত হইয়াছিল। বরিশাল জেলার সেই দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোক অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ও আশ্রয় স্থানাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। গিরিজাপ্রসন্ন সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া অবলোকন করিয়া, তাঁহার দেশের চতুর্দ্দিকস্থ দুঃস্থ পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি স্বহস্তে অনশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধাশন-পীড়িত, আশ্রয়বিহীন কাঙ্গাল গরীবদিগকে, টাকা পয়সা ও বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া, রক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই অদম্য দেশহিতৈষণা ও সহৃদয়তার ফলে অনেকে আশাতীত সাহায্য লাভ করায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় ঐ ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া দেশহিতকর "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রশংসা-সূচক প্রবন্ধ লেখেন। গিরিজাপ্রসন্ন উহা পাঠ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দুর্ভিক্ষের সেবা-কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছ, বাস্তবিক প্রশংসিত হইতে পারি, দুর্ভিক্ষে এরূপ কোন কার্য্যই আমি করিতে পারি নাই। তুমি কেন ঐরূপ অযথা প্রশংসা করিয়াছ? আমি তোমার বিরুদ্ধে উহার প্রতিবাদ করিব।" ভৃত্য সাধারণতঃ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার যশ ঘোষণা করিতেই চেষ্টা করে। ইহা অস্বাভাবিক বা অপকর্ম্ম নহে। কিন্তু কয়জন প্রভু, ভৃত্যের সেই দেশ-প্রচলিত প্রশংসা স্মরণ করিয়া, অহঙ্কৃত বা গৌরবান্বিত হওয়ার পরিবর্ত্তে তল্লাভের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা চিন্তা করিয়া থাকেন? গিরিজাপ্রসন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পাদিত কার্য্যের জন্য প্রশংসা-বর্দ্ধনকে

অযথা প্রশংসা-বর্ষণ মনে করিতেন। এইরূপ অকৃত্রিমতার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে হৃদয় স্বতঃই প্রফুল্লিত হয়।

শ্রেষ্ঠ জীবনের মূল্য জ্ঞান।

পরোপকারিতার কথা কতইবা উল্লেখ করিব। গিরিজাপ্রসন্নের দেশস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় কবিরাজি ব্যবসা চালাইবার জন্য একবার কলিকাতায় ঔষধালয় সংস্থাপন করেন ও তথায় তিনি ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হযেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয় যেমন বিদ্বান, তেমনই ধার্ম্মিক। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রের সাধুলোক আজকাল বড়ই দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বাস কালে ইনি হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন, গিরিজাপ্রসন্ন তখন কোন কারণবশতঃ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। সহৃদ্ গিরিজাপ্রসন্ন পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুরারোগ্য পীড়ার সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্তের জন্য তাহার কোন ভ্রাতাকে তথায় প্রেরণ করেন। এবং কবিরাজ মহাশয়ের পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ না করেন, তাহার সদুপায় বিধান করেন।

ভক্তিভাজন কবিরাজ মহাশয় একদিন গিরিজাপ্রসন্নের গুণের কথা আলোচনা করার সময় ব্যক্ত করিয়াছেন, "গিরিজা বাবুর নিকট আমি চির ঋণী, তাঁহা দ্বারা আমি অনেক সময় অভাবনীয় উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ তিনি আমার ব্যারামের সময় যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। তাহার গুণের সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

যৌগিক।

বিজ্ঞান নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, এই পৃথিবীতে, কয়েকটী মাত্র অমিশ্র ধাতুর মিশ্রণে সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে—এই পৃথিবী জীবের বাসের যোগ্য হইয়াছে। ধারাবাহিকরূপে সে সকল বৈজ্ঞানিক কথার অভিব্যক্তি, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অন্যবিধ।

এই পৃথিবীতে জীবে জীবে এবং জীবে জড়ে যে আকর্ষণ—তাহাও বিবিধ কথায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রেমযোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তিযোগ, নিবৃত্তিযোগ, প্রকৃতিযোগ, পুরুষযোগ, কতযোগের কথাই শুনিয়াছি। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সকলের মধ্যগত যে শক্তি সংসারকে স্বর্গে টানিতেছে, সেই ইচ্ছা-শক্তির বিষয়ই কিছু অনুকীর্ত্তন করিব। ইচ্ছার পরিস্ফুরণেই এই সৃষ্টি অভিব্যক্ত।

একটী বৃক্ষ শাখায় দুটী পক্ষী,—এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে দেখ্,—দুই মিলিয়া মিশিয়া একাত্মক। একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, একত্র আহার, একত্র বিহার, একত্র শয়ন, একত্র স্বপন,—দুই মিলিয়া মিশিয়া যেন এক। এই চিত্রের অনু-

ধ্যানে উপনিষদকার মহা প্রহেলিকায় উপনীত! কি মধুর মিলন!!

বৃক্ষ ছাড়িয়া পরিবারে আসিয়া দেখি, পুরুষ ও প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব মিলন;—নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, কি অপূর্ব্ব যোগে আত্মহারা,—একের অস্তিত্বে অন্য জীবিত,—কি অপরূপ মাধুর্য্যে বিভোর!!

আর একটু তলাইয়া দেখি, কি নেশায় বিভোর হইয়া বুদ্ধ,নিরঞ্জন-তটে আত্মবিস্মৃত, ঈশা পালেসটাইনে স্বেচ্ছা-বর্জ্জিত,গোরা সোণার নবদ্বীপের এবং রামকৃষ্ণ কামারপুকুরের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া,স্বেচ্ছা ও কামনা-বর্জ্জিত হইয়া, মহাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। আরো অন্তরে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি,—পিতামাতার ভালবাসার বন্ধন,ঐশ্বর্য্যের চিন্তন, সব ভুলিয়া, ম্যাট্‌সিনি কি এক মহা শক্তিতে বিভোর,—কিছুতেই ফিরিলেন না, দেশের কালিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে, সেই যে আল্পস্ পর্ব্বতে দেহত্যাগ করিলেন,—কই আর ত ফিরিলেন না!!

আরো একটু ডুবিয়া দেখি, অন্তরের ভিতর কে সদা জাগিতেছে? আমার কথা সে শুনে না, আমার সংসারের মঙ্গল সে ভাবে না। সে সংসারের অতীত কি সব কথা বলে, আমি কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রবৃত্তির পথ হইতে সে নিবৃত্তির পথে টানিতেছে, সে জড়ের বন্ধনের মধ্যে চিন্ময় বন্ধনের আয়োজন করিতেছে;—আমি কিছুতেই ঠিক হইতে পারিতেছি না। করি কি, যাই কোথা? আমার অন্তরে কে গো নিবৃত্তিরূপে, শ্রেয়রূপে, বাণী রূপে, আদেশ রূপে প্রকাশিত গো! আহা, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি মধুর যোগ গো!! আমি ত ধূলি ক্ষুদ্রের মমীয়ান, পাপ সন্তাপে অনাকর্ষিত অমাবস্যা;—আমার প্রতি তাঁহার এ কি ভাব গো!

তাঁহারা বলেন, উহা মিথ্যার খেলা, কল্পনার জড়তা,উহা মোহের প্রকম্পন, কিন্তু সে সব কথা অনেক বার অনেক প্রকারে শুনিয়াও, আমি, তুমি, সে, চির-পরাজিতের ন্যায়, সেই অপরাজিতের দিকেই অগ্রসর হইতেছি কেন? আমরা এ ক্ষেত্রে জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, মায়াহীন, মমতাহীন,—পরাজিতের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আমরা এখন আত্মিক জগতে অনাত্মিক, আমরা এখন দেহময় রাজ্যে অদেহী, আমরা এখন জড়ময় ভুবনে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত অমর। তোমরা পাগলের উক্তি শুনিয়া হাসিতে থাক, আমরা অতীন্দ্রিয়ে বিভোর হইয়া থাকি। ইচ্ছা, ইচ্ছা, ইচ্ছা, চতুর্দ্দিকে কেবল ইচ্ছার প্রকম্পন। ইথর বা বিদ্যুৎ হইতেও উহা তীক্ষ্ণ। স্বাধীনতার রাজ্য কোথায়? ঐ মহা ইচ্ছায় ডুবাইবার জন্য ইচ্ছাময়ের কি অনাহত চেষ্টা।

প্রথম যখন ডাক শুনিলাম, বুঝিতে পারি নাই, কে অস্পৃষ্টকে এখন মধুর স্বরে ডাকে। কিন্তু যখন যাত্রা করিলাম,—একাকীত্বের গহনে যখন প্রবেশ করিলাম—কত মধুর স্বরে, কত সম্মোহন স্বরে, কত স্পষ্ট অজেয় বাণীতে আমাদিগকে আরো ডাকিলেন। আমাদের প্রাণ রাধা আর সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, আমাদের কামনা-অর্জ্জুন আর স্বাতন্ত্র্যে মজিতে চায় না। সেই যে সুধা-বিনিন্দিত বংশীধ্বনি কবে কোন্ নিভৃতে বাজিয়াছিল,তাহাতে আচম্বিতে আমাদিগকে বিভোর করিল কেন গো! এখন, এই অন্তিমে, বুঝিতেছি, উহা আর কিছুই নয়—ইচ্ছাময়ের মহা ইচ্ছার তাড়না মাত্র। "নেতি, নেতি" বলিতে বলিতে যাজ্ঞ

করিয়াছিলাম, এখন "সেই" "সেই"-ময়-ধামের নিভৃত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছি। এখন আর ত কিছু দেখি না, বুঝি না, বুঝি কেবল তিনি, কেবল তিনি। এই বিশ্বসংসার ইচ্ছাময়ের মহা ইচ্ছারই বিবৃতি।

বন্ধুরা প্রতিনিয়তই কতরূপে বলেন, এই জড়ময় ভুবনে, পাপ প্রবৃত্তির এবং আসুর বুদ্ধিরই জয়। তাঁহারা বলেন, "চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, অনাচার, কদাচার, —পাপ প্রলোভনের বিভীষিকা, অন্যায় এবং অসত্যের তাড়না, ইহার মধ্যে তোমরা ছাই কি সত্য এবং ন্যায়ের স্বপ্নে বিভোর হইতেছ?" বলেন, "জোর যার মুলুক তার, জান না কি? জান না কি, পাশবশক্তিরই এই পৃথিবীতে জয়?" শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াই বটে, কিন্তু ঐ বংশী তবুও অন্তরে মধুর রবে বাজে। বল ত, এই ভয় বিভীষিকার রাজ্যে আমরা এখন কি করি?

আমরা ত আর কোন উপায় দেখি না, উপায়—কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-যোগে যুক্ত হওয়া এবং ঐ বাণীর নির্দ্দেশে অগ্রসর হওয়া। জুডাস্ ইস্কারিয়ট জীবিত, না সত্য জীবিত?—না সত্য রক্ষক খ্রীষ্ট আজ জীবিত, বলত? সকলে যখন খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে—নির্য্যাতনের চরম দৃশ্যে যখন বধ্যভূমি পরিপূরিত, তখন "তিনি" অবতরণ করিয়া মহা সত্যের জয় ঘোষণা করিলেন;—মেরি ম্যাক্‌ডেলিন তখন তন্ময়, ইচ্ছা-যোগ-স্বরূপে আত্মহারা! যত যোগের কথা শুনিয়াছ, এই ইচ্ছাযোগে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ যোগ আছে কি?

আমাদের মন চায় প্রবৃত্তির পথে যাইতে, কিন্তু কে যেন সদা সতর্কিতে আমাদিগকে ফিরাইতে তৎপর। আদি কাল হইতে এইরূপ তাড়না চলিতেছে। কেবল তোমার আমার উপর এ তাড়না নয়, জগতের সকলের উপর নানারূপ তাড়না চলিতেছে। পিতা মাতা, গুরু নেতা—সকলের তাড়নাই ঐ তাড়না-মূলক। এ-তত্ত্ব কেহ বুঝে না, কেহ দেখে না, কেহ ধরিতে পারে না। কিন্তু ঐ তাড়নার হাতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ইচ্ছার উপর মহা ইচ্ছার তাড়না, সর্ব্বদা, সর্ব্বদেশে চলিতেছে।

মন যখন বিপথে যাইতে চাহে, তখন "সংযম" বলে, ঐ বাণীর কথানুসারে, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। একাজ করি, কি ওকাজ করি, চিন্তা না করিয়া, নিজ ইচ্ছাকে সংহত করিয়া ঐ ইচ্ছার অনুসরণ করা উচিত। এইরূপে স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বলি দিতে দিতে, শেষে "একতমের" ইচ্ছাই কেবল জাগিয়া উঠে। মার পিশুন তখন নিরঞ্জন-তটে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, মহেশ্বরের একতম ইচ্ছাই তখন শাক্যকে "সিদ্ধার্থে" পৌঁছাইয়া দিতেছে।

আমরা সদা কেবল বিরোধের রাজ্যে ঘুরিতেছি। সকল বিরোধের মূল কারণ ইচ্ছার বিরোধিতা। স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ, পিতাপুত্রে বিরোধ, ভ্রাতাভগ্নীতে বিরোধ,—পরিবার সকল বিরোধের লীলাস্থল। দেশের অবস্থা, পরিবারেরই অনুরূপ,—ঘরে ঘরে, জাতিতে জাতিতে, ধনী দরিদ্রে, জ্ঞানীমূর্খে—কেবল বিরোধ, কেবল সংঘর্ষণ। দেশ ছাড়িয়া রাজ্যে যাও, সেখানেও কত বিরোধ, রাজা প্রজায় কত কত বিরোধ,—রাজার ইচ্ছায় প্রজা চলে না, প্রজার ইচ্ছায় রাজা চলে না, কত বিরোধ! এই সকল বিরোধের সমীকরণ-মন্ত্র কোথায়? মহা-ইচ্ছা-যোগ-যুক্ত না হইলে, এই সংসারে, সর্ব্বপ্রকার বিরোধের সমীকরণ বা নিরসন সম্ভব নয়। ইচ্ছা-যোগই মহাযোগ—

সংসারের শ্রেষ্ঠ যোগ। মানব-খ্রীষ্ট যখন বলিতে পারেন যে,"I and my father are one" অথবা মানব-চৈতন্য তখন বলিতে পারেন "মুইসেই, মুই সেই"—তখনই ইচ্ছা-যোগের রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। অথবা মানুষ যখন বলিতে পারে, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—তখনই পাপ ইচ্ছা সংহত হইয়াছে এবং ইচ্ছাময়ের সুবিমল ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই পথে যাওয়ার মূল মন্ত্র কি,—"সংযম।" যেরূপেই হউক, আপন ইচ্ছাকে প্রবৃত্তির পথানুসারিণী না করিয়া, সংযমের পথে আনিতে হইবে। এই সংসারে, কে পিতা, কে মাতা, কে গুরু, কে নেতা, কে রাজা, কে সম্রাট? পিতা মাতা, গুরু নেতা, রাজা সম্রাট যখন মহা-ইচ্ছা-যোগ-সাগরে আপন প্রবৃত্তির স্বাতিন্ত্র্য ডুবাইতে পারিয়াছেন, তখন পিতামাতা, গুরু বা নেতা, রাজা বা সম্রাটের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে। যত দিন জড়ীয় শক্তিতে উঁহারা শক্তিমান, ততদিন বিরোধ বিসম্বাদ কিছুতেই তিরোহিত হইবে না। কিন্তু যখন উঁহারা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় নিমগ্ন, তখন, উঁহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করা, কিম্বা যোগ-পথে বিচরণ করা একই কথা। সর্ব্ব প্রযত্নে, অহং-জ্ঞান-নির্ব্বাপিত, স্বার্থত্যাগী পিতামাতা, নেতা বা রাজার অনুসরণ করাই ইচ্ছা-যোগ পথে বিচরণের উপায়। কিন্তু উঁহারা যখন রিপু ও স্বার্থের দাস, অহংজ্ঞানের চেলা, তখন তাঁহাদের হাত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া,সংসার,দেশ বা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ আত্মার মূলে অবগাহন করিয়া, পরমাত্মা-রূপী ইচ্ছার অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাতে যদি পরিবার বা সমাজ, দেশ বা রাজ্য যায়, তাহাতে ভয় পাইতে হইবে না। তখন বীরের ন্যায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বরাজ্যের নিভৃতে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। তাহাই আসল যোগের কথা। এই সংসার-বিদ্যালয়ে, স্বতন্ত্রতার রাজ্যেই, সংযম বলে, আপন স্বেচ্ছাকে সংহত করিতে হইবে। যখন এই ব্রত পালনে সমর্থ হইবে, তখন পরিবার সুখের, সমাজ শান্তির, দেশ আরামের এবং রাজ্য মহা গৌরবের জিনিস। তদন্যথা, সব কেবল অশান্তিময়।

ইচ্ছা-যোগ সাধনের নামান্তর—প্রেম-সাধন। সেই মহেশ্বরের মহা ইচ্ছা, জড়ে, জীবে, উদ্ভিদে, কীটে, পতঙ্গে ও উদ্ভিদে সমভাবে কাজ করিতেছে, যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন কাহাকেও সাধনার বিরোধী মনে হইবে না। তখন যাহাকে দেখিবে,যাহাকে পাইবে, তাহাকেই সাধনার সহায় বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাকে জলে স্থলে, জীবে জড়ে পূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ দেখিয়া, সকলকেই তখন আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইবে। তখন পরিবার, সমাজ, দেশ, সাম্রাজ্য—একাত্মক,এক-ধর্ম্মক। অথবা ও সকলের অন্য অর্থ—ইচ্ছা মিলনের মহাযোগ। তখন মানুষ, আত্মা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাজ্য মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিয়া বিমোহিত এবং সকলকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হয়। তাহারই অপর নাম জাতীয় একতা। বিশ্বরূপে জন সাধারণের দীক্ষা হইলে, জাতীয় একতা দেশে অবতীর্ণ হয়।

বলিতে চাহিতেছিলাম, এই ইচ্ছা-যোগ, বা প্রেমযোগ সাধন ভিন্ন জাতীয় একতা—পরিবার-বন্ধন, দেশ-বন্ধন, বা রাজ্য-বন্ধনের আর কি কোন অর্থ আছে? ইচ্ছাযোগ-সাধনই পরম সাধন;—সকল বন্ধনের মূল বন্ধন—ইচ্ছাযোগ বন্ধন। অথবা বিরোধী ইচ্ছার বিলোপ হইলেই, স্বপরিবার,স্বসমাজ, স্বদে

স্বসাম্রাজ্য—শান্তি এবং সুখের হয়। ঐকতানিক বাদ্যের ন্যায় সব সুর যখন মিলিয়া গিয়াছে, তখন একতন্ত্রী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে; তখন একজন এ পথে, আর একজন সে পথে যায় না। তখন এক ইঙ্গিতে সকলে চালিত হয়। জাপান-মিকাডো, জোয়ান-ফ্রান্স, ম্যাটসিনি-ইটালী, প্রতাপ-মিবার, অর্জ্জুন-শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ-শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মূর্ত্তির আর অন্য অর্থ নাই;—অর্থ—ইচ্ছাযোগ-সিদ্ধ প্রেমমূর্ত্তি। ইচ্ছা-যোগ সাধন-বলে জগতের যে উপকার হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

আজকালকার ন্যায় ঘোর দুর্দ্দিনে, এই ইচ্ছাযোগ-সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন,—এদেশের বায়ু আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে,—আবার জাতীয় একতা অবতরণ করিবে। বিশ্বরূপ ঘরে ঘরে প্রকটিত হউক—মহামায়ার মহা ইচ্ছার জয় হউক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন।

জন্ম—১৭ই ভাদ্র, ১২৫০ সাল, শকাব্দা ১৭৬৫, শুক্রবার, শুক্লপক্ষ, রাত্রি অনুমান ১২ ঘটিকা, খান্দারপাড় গ্রাম। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু—২৯শে মাঘ, ১৩১৫ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণপক্ষ, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খ্রীঃ। রাত্রি আনুমানিক ১০ ঘটিকা।

যাঁহাদিগের অভ্যুত্থানে ধরা ধন্য হইয়াছে, দ্বারকানাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। দ্বারকানাথ ফরিদপুরের গৌরব। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। হায়, দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে না করিতে, তিনি স্বগত হইলেন। দেশের ঘরে ঘরে আজ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে।

দ্বারকানাথ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে দেবদুর্লভ চরিত্র ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা আজীবন তাঁহাকে সর্ব্বপূজ্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও নিরহঙ্কার মূর্ত্তি, তাঁহার উদারতা ও মধুর বাণী সকলকে মোহিত করিত; যে তাঁহাকে দেখিত, সে-ই মনে করিত, দ্বারকানাথ মানব দেবতা।

দ্বারকানাথ দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা-বলে, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি পূর্ব্ব কথা ভুলেন নাই ও বিলাসী হন নাই। এ সংসারে দেখিয়াছি, কত শত শত দরিদ্রের বন্ধু, ধনী হইয়া, শেষে আর দরিদ্র বন্ধুর সহিত সম্বন্ধ রাখেন না; কিন্তু দ্বারকানাথের চরিত্রে এ কলঙ্ক কখনও স্পর্শে নাই—তাঁহার সকল বন্ধুকেই তিনি আজীবন সমান ভাবে ভালবাসা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বজন-বাৎসল্য মহাত্মা বিদ্যাসাগরের যোগ্য। তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার স্মরণ হইলে, মনে হয় যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ চিত্র অহং-জ্ঞানসর্ব্বস্ব বঙ্গে বড় বিরল।

সে দিন মহামান্য শ্রীযুক্ত এস, পি সিংহের উদারতার কথা শুনিতেছিলাম। তিনি উচ্চপদ পাইয়া, যে সব বন্ধু প্রথমে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ গুণ দ্বারকানাথের জীবনের ভূষণ ছিল। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে একদিনও ভালবাসিয়াছিল কিম্বা একদিনও সাহায্য করিয়াছিল, তিনি আজীবন তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় দ্বারকানাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর।

পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি কত দরিদ্র রোগীকে কপর্দ্দক না লইয়াও চিকিৎসা করিয়াছেন এবং কত দরিদ্রকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি বলিতেন,—"চিকিৎসা করা আমার কাম, অর্থ গ্রহণ আমার কাজ নয়, যে যাহা পারে, দিবে, না পারে, না দিবে।" আরো বলিতেন,—"জানিবেন, কেহ কাহারও নিকট ঋণী থাকে না, যে উপকার পায়, এক দিন সে প্রত্যুপকার করিবেই করিবে।" এই দুই মন্ত্র তিনি চিরদিন জীবনে সাধন করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকানাথ আজীবন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন।

দ্বারকানাথ অদ্বিতীয় পণ্ডিত-কবিরাজ

ছিলেন, কিন্তু সে জন্য তাঁহার আদর ছিল না, তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, সে জন্যও বুঝি বা তাঁহার সম্মান ছিল না। তাঁহার সম্মান—তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্রে। তিনি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তি ছিলেন। যে ধর্ম্মসাধন বলে মানব দেবত্বে উন্নীত হয়, দ্বারকানাথ সেই নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম-সাধন-বলে মানব-চরিত্রের অনিন্দিত পূতাংশ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেহ কখনও তাঁহার ইন্দ্রিয়-স্খলন বা চিত্তবিচ্যুতির পরিচয় পায় নাই। তদীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে সদা বিরাজিত থাকিত—বিনয়, সহৃদয়তা, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য। তিনি অসাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, এই ধর্ম্মবলেই তিনি অন্তশ্চক্ষুর দৃষ্টিবলে রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন, যাহাকে যে ঔষধ দিতেন, তাহাতেই তাহার রোগ আরোগ্য হইত। তিনি যে রোগীর ভার সানন্দে গ্রহণ করিতেন, নিশ্চয় সে আরোগ্য হইত। এরূপ কত ঘটনা জানি। সন্দিগ্ধ ভাবে, টাকার খাতিরে, প্রায়ই রোগী গ্রহণ করিতেন না, যদি কখনও করিতেন, হয়ত তাহার ফল ভাল হইত না। অনেক সময় অনেক রোগীর ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতেন, "কিছু হইবে না, অযথা অর্থব্যয় করাইতে পারি না।" পূতচরিত্রের বলেই তিনি অসাধারণ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। কখনও সংবাদপত্রে একটী বিজ্ঞাপন দেন নাই—তবুও তাঁহাকে না জানে, বঙ্গে এমন লোক নাই। শুধু বঙ্গ কেন, ভারতের এমন স্থান নাই, যে স্থান হইতে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থ শিষ্য না আসিত। তাঁহার বাটী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যেন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমাদের মনে হয়, তাঁহার সমান চিকিৎসক কলিকাতাতে আর অভ্যুদিত হয় নাই। এই ক্ষমতায় ৺গঙ্গাধর এবং গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি মহাজনদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি চিরকাল "স্বদেশী" থাকিলেও, গবর্ণমেণ্ট, তাঁহাকে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি তাহাতেও "স্বদেশীত্ব" এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই। যোগ্য ব্যক্তিতে উপাধি দান এই বঙ্গের প্রথম ঘটনা। কত সময়ে তিনি কত অমূল্য কথা বলিতেন, এখন নিভৃতে বসিয়া ভাবিতেছি, সে সকলই তদীয় দেবদুর্লভ চরিত্রের যোগ্য। বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিতে বিরত রহিলাম। কিন্তু এ কথা না লিখিলে প্রত্যবায় আছে যে, আমরা তাঁহার চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া মহেশ্বরের চরিত্রের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি এই বঙ্গে প্রকট দেবমূর্ত্তি ছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে আমাদের হৃদয়শূন্য, ফরিদপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন, কলিকাতা শোকাচ্ছন্ন। তাঁহার তুলনা কেবল তিনিই ছিলেন। তাঁহার পূত দেব-চরিত্র তাঁহার বংশে সংক্রামিত হউক, বিধাতার নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এখানে তুলিয়া দিলাম। "তাঁহার বংশ পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন, শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুসেন বংশীয়। কবিরাজ মহাশয়েরা বংশানুক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা সীতারাম রায়ের সভার প্রধান পণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। সীতারাম তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত করেন। অভিরামের পুত্র দুর্গাদাস শিরোমণি পিতার সুযোগ্য পুত্র ও শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ কৃতী ছিলেন। এই পরিবারে বংশানুক্রমে যে টোল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে বাঙ্গালাদেশের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শিক্ষা লাভ করেন। 'রসেন্দ্র সার-সংগ্রহ' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ গোপাল কর, দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রথিতনামা শঙ্কর কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। কুমারটুলীর সুবিখ্যাত গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের পিতা স্বনামধন্য নীলাম্বর কবিরাজ দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দর কবিরাজের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে বিক্রমপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদে, ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজের টোলে ন্যায় দর্শন, স্মৃতি, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও এইখানে অধীত হয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ শুভক্ষণে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসার সুযশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি জীবনে কখনও কোনও বিজ্ঞাপন দ্বারা আত্মপ্রচার করেন নাই. কিন্তু ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম প্রচারিত ছিল। সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের এতদূর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেক রোগী তাঁহার দর্শনলাভ মাত্রেই যেন রোগমুক্ত হইলেন, এরূপ মনে করিতেন। এই অসাধারণ গুণবলে তিনি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজন্যবর্গ তাঁহাকে, পারিবারিক চিকিৎসার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিতেন। এই সকল রাজন্যদিগের মধ্যে মিবারের মহারাণা বাহাদুর একতম। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার যুবরাজ বাহাদুরের বিশেষ অসুস্থতার জন্য, মহারাণা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া লিখেন। সরকার বাহাদুর দ্বারকানাথকেই মনোনীত করিয়া মিবারের রাজধানী উদয়পুরে পাঠাইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের অসামান্য চিকিৎসা-খ্যাতিবলে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহ হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাঠী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, ভারতবর্ষে শিক্ষিত এমন হিন্দুজাতি নাই, যাহারা দ্বারকানাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাই। ভারতবর্ষের বহু স্থানে—বম্বে, মান্দ্রাজ, লাহোর, দিল্লী, মুলতান, জয়পুর, রত্নগিরি, হয়দরাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে ও বঙ্গের প্রায় সকল স্থানেই তাহার ছাত্রগণ আজও চিকিৎসা করিতেছেন। গত চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিকট আনুমানিক পাঁচ হাজার ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে তিনি পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেন। তাহাদিগের সহিত সদাই হাস্য কৌতুকে কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাহাদিগের সুচারু শিক্ষার জন্য তিনি সুশ্রুতের বিশদ্ টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কুটীল গতিবশতঃ তাহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

দ্বারকানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বরোগপ্রশমনী চিকিৎসা-ক্ষমতা দর্শনে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি-ভূষিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে আর কেহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উপাধি পান নাই।

দ্বারকানাথের মন অশেষ অসাধারণ গুণে পূর্ণ ছিল। তিনি বহু লোকের আশ্রয়-স্বরূপ ছিলেন, যে কোন দরিদ্র অনাথ তাঁহার নিকট আসিত, সে নিরাশ্রয় হইত না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার দান গ্রহীতা ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। দেবতা ও ব্রাহ্মণে তাঁহার অসাধারন ভক্তি ছিল, যথার্থ পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন, তিনি তাঁহাকেই কিছু না কিছু বিদায় দিতেন। কেহ কখনও তাঁহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হন নাই। যথার্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের নিকট, দরিদ্র অনাথ আতুরব্যক্তিদিগের নিকট ও স্বজাতির নিকট তিনি কখনও দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। তিনি জীবনে কখনও বিলাসিতার ধার ধারেন নাই। তিনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন, সকলের সহিতই হাস্য কৌতুকে আলাপ করিতেন। বিষয় সম্পত্তি রক্ষণে ও মোকর্দ্দমা মামলা পরিচালনে তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। হাইকোর্টের জটিল মোকর্দ্দমাতেও অনেক সময় উকীল ও ব্যারিষ্টার প্রভৃতি না রাখিয়া স্বয়ংই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবি, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল; যে রোগীকে একবার চিকিৎসা করিয়াছেন, বিশ বৎসর পরে দেখিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন। উপনিষদ্ প্রভৃতি তিনি স্বয়ং হাতে লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। একই সময়ে তিনি রোগীর নাড়ী দেখিতেন, কাহারও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, কাহাকেও বা উপদেশ দিতেন। পরোপকার তাঁহার

জীবনের সর্ব্ব প্রধান ব্রত ছিল।

স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় দ্বারকানাথ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভায় (কংগ্রেসের কলিকাতাস্থ প্রায় সকল অধিবেশনেই) তিনি সভ্য অথবা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিতেন। স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জনে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ছিল।

প্রায় আট মাস পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের একটু সামান্য জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উদর রোগে পরিণত হয়। গত ভাদ্র মাসে ৺কাশীধামে যাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়া যায়। এই রোগেই গত ২৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটার সময়ে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।"

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৫। সিদ্ধিতত্ত্ব বা কর্ম্মপথ—শ্রীকুমুদিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। পরিপাটী বাঁধাই; ছাপা মন্দ নয়। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা গ্রন্থকারের সকল মত অনুমোদন করিতে পারি না। আলোচ্য বিষয়ের অবান্তরিক জটিল কোন কোন প্রশ্ন লইয়া গ্রন্থকার নানা স্থানে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলেই বোধ হয় সেগুলি অপ্রকাশিত রাখিতে পারিতেন। তবু, পুস্তক খানি বেশ সুখপাঠ্য এবং রচনার পারিপাট্যে উন্নত। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

৩৬। শ্রীরামকৃষ্ণ নামামৃত।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত; মূল্য।০ আনা। ভূমিকায় প্রকাশ যে পুস্তকখানির উপসত্ব কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দের নামে বেলুড় মঠে যে মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। সাধু উদ্দেশ্য। সঙ্গীতগুলি ভক্ত প্রাণের পবিত্র স্বাভাবিক হৃদয়-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

৩৭। মাধবার-প্রসূন।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ, এল-এম-এস্ প্রণীত। সুহৃদ্ প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ১৲ টাকা। গোস্বামী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি নানা বিষয়ের রচনায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত এই পুস্তকখানি আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। এই খানি ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক। সরল ভাবে আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল গ্রন্থে সর্ব্বত্রই প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থকারের হৃদয়ের সরল বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। নাটক হিসাবে গ্রন্থখানির সফলতা না হইয়া থাকিলেও, অত্যুচ্চ ভাব, মার্জ্জিত রুচি, সমুন্নত সন্দর্ভে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ; পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

৩৮। দাম্পত্য চিত্র।—শ্রীক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। আবরণ চাকচিক্যময়। চাকচিক্যে বালক ভিন্ন কে ভুলে? এই গ্রন্থখানির—'কবি' একস্থানে লিখিতেছেন,—"চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছি কিনা, সে কথা জানিবার জন্য আমার ব্যাকুলতা নাই।" অতএব, সমর্থ হইয়াছেন কিনা, তাহাও প্রকাশ করিবার ভার হইতে সমালোচক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য যে 'কবির' যদি রুচিমার্জ্জিত হইত, তবে তিনি সাহিত্যের যথার্থ সেবা করিতে পারিতেন। রুচি অতি কদর্য্য।

৩৯। বৌ-কথা-কও।—শ্রীক্ষিতিনাথ প্রণীত; মূল্য।৶১০ আনা। দাম্পত্যচিত্রের কবির 'মন এখন কল্পনা জগতে উধাও ছুটিয়াছে; ফিরাইবার উপায় নাই।' আমাদের সবিনয় নিবেদন, তাঁহার ক্ষমতাকে তিনি বিশেষ কৃপণতার সহিত ব্যয় করুন; অথবা যদি সম্ভব হয়, তাঁহার অভিরুচিকে অপর কোন উচ্চতর প্রসঙ্গের প্রতি 'ধাবিত' করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হই[illegible]